KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : কবিতা ভবন, 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : বিকল্প	Size : 5"x8" 12.70x 20.32 c.m.
Vol. & Number :	Year of Publication : ১৩৪৮ ১৩৫৪ ॥ 1957
	Condition : Brittle Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু, অজিত ৪৩, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রতিভা বসু	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

বেশাখী

সম্পাদক

প্রতিভা বসু

বৈশাখী ১৩৬৪

—এই সংখ্যায়—

প্রবন্ধ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশ গুহ, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার,
সন্তোষকুমার ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
মৃণাল চৌধুরী

উপন্যাস

মালতীদির গল্প—প্রতিভা বসু

কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, মৃণালকান্তি,
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক,
বুদ্ধদেব বসু

বৈশাখী

১৩৬৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রতিভা বসু-সম্পাদিত

দেড় টাকা

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

চলতি

অমিয় চক্রবর্তী

অদৃশ্য

আসতে পথে নদীতে নেয় ঠাণ্ডা কুশল—
সাইপ্রেসে নেয় ঝিরির শব্দ,
ছায়া স্তব্ধ ;
আনে মৃদু ধানের গন্ধ
ঘর থেকে সেই কাঁচের কোমল,
মাথায় চুলে রেণুর ঝরন,
বুকের স্পন্দ ;
এক ইঞ্চি সে নীলাম্বরের মুক্তোবরন
দিগন্তরে যুক্ত করে হারিয়ে-যাওয়া ;
—স্মৃতির হাওয়া ॥

শিল্পশেষ

দুঃখাশ্রুকে রূপ দেয়া বরফ জমিয়ে,
সেই শুভ্রতায় জ্যোৎস্না ধরা,
—রাত্রে তাই চেয়ে দেখা ॥

যে যার পথে

পাথরে বসেছে গাঙচিল ;
প্রবালদ্বীপের খাঁজে কুঞ্জের সংকেতে
খুঁজে নামে নীচু-নাক প্লেন, বিন্দু নীল
আদিঅন্তহীন প্যাসিফিকে,
ঘর্-ঘর্ একটু ডাঙা কি ও।

চলতি

মিড্‌ওয়ের নীড় থেকে অদৃশ্যে আবার
দুদণ্ডের চিল উড়ে যায়,
গুঞ্জিত এঞ্জিন চলে প্রকাণ্ড পাখায়—
অদৃশ্যে টোকিয়ো ॥

একবার

আর্দ্র শুক্ল রং
পারুল পুষ্পিত পথে শাদা প্রজাপতি
চলেছে একটি শুভ্র মুহূর্ত নেশায়,
ফেরার সময় নেই ॥

সান্নিধ্য

কাছে এলো ষোলো কলা চাঁদ শূন্যে দুলে
পূর্ণিমায়,
প্রতিবেশী জ্বলন্ত আকাশী ;
নিঃসঙ্গের সঙ্গ তার সোনার অলিন্দে রেখে যায়,
পাতা-খোলা বই ভুলে
দেখো চেয়ে মৃত্তিকার ধরাবাসী ॥

আরবিক

আর কত বেশি করতে সে পারে
ঐটুকু স্রোত—
পাশে পাশে শুধু ব'য়ে যেতে ধারে,
পারে সে ধরতে ছলছল জ্যোতি,
সবুজ করতে সামান্য ঢেলে
অশ্রুকণার গতি ॥

বৈশাখী ১৩৬৪

পরের দিনের বৃষ্টি-শুকোনো
একলা দুপুরে নেই আর সে তো,
পাশের শব্দ, মধুর চেতনা
নেই কিঙ্কিণী,
অন্তরালের কোথায় লুকোনো
পাবে তাকে পথ চিনি' ॥

বস্টন ১৯৫৬

মাক্স্ জাকব্ : নাম

(জন্ম ১৮৭৬ : মৃত্যু ১৯৪৩, নাৎসি বন্দীশালায়)

বিষ্ণু দে

তোমার নাম, হে অজ্ঞেয়,
সূর্যদীপ্ত কুয়াশার নামে এক সেতু ।
তোমার কিই বা জানা যায় তোমার নাম ব্যতিরেকে ?
ভক্তি তোমার নামে সৃষ্ট ! ভক্তি···
তোমার নাম আমার হৃদয়ে তো তোমার উপস্থিতি নয়—
পরন্তু বহু পবিত্র নামের ব্যাখ্যান মিলন নয়—
আমার স্মৃতি একটি নৈবেদ্য, আমার সাধ আমার আঙুলের রক্ত
কালিয়ে যাক তোমার খোঁজে
তোমার নাম আমার কানে বাজে এক কোলাহল আর আমি
ভালোবাসি স্তব্ধতা

তোমার সূর্যে নাগাল পেতে লাগে প্রেমের একটা বিস্ফোরণ
তুমি আমায় ভালোবাসো আমি কষ্ট পাই ব'লে
আমি তোমায় ভালোবাসি আমি কষ্ট পাই ব'লে
আর আমি ভুলে যাই তোমার নাম অতৃপ্ত আবেগের আকুতিতে ।
যেন বা এক পণ্ডিত যে আরো জ্ঞানের সন্ধানে
তার রাত্রির ঘুম আহুতি দেয়,
আমি, বুভুৎসু, জ্বালিয়ে দিই আমার মেদমজ্জা আর দেহের সব সুখ
যাতে তুমি আমাকে অপাবৃত ক'রে দাও যা আছে তোমার
নামের আড়ালে ॥

দুটি কবিতা

মৃণালকান্তি

পূর্বরাগ

কে আসে কে যায়, আকাশের মতো মন
সূর্যের রঙে বদলায় সারাখন :
ধূপের মতন একাকী আঁধারে পোড়ে,
ঘোরে ধূ-ধূ নীল স্বপ্নের প্রান্তরে।
বৈশাখে মেঘে, বৃষ্টি-ধারার গানে।
কে আসে কে যায়, ব্যথা-বিদ্যুৎ হানে।
রাতের শিশিরে রুক্ষ দিনের দাহে
ফোটে যে আশার করুণ কুন্দকলি—
উদ্দেশে দিই মুঠো-মুঠো অঞ্জলি।
বেঁধেছ আমারে জীবনে মরণে তুমি—
একটি ধ্যানের অসীমে হয়েছে হারা,
দিনের সূর্য, আমার সন্ধ্যাতারা॥

নিঃসঙ্গ

দিনগুলি যেন ভাঙা বাসাছাড়া পাখি,
উড়ে উড়ে যায় মুছে যত পিছু ডাকি।
সংসার জুড়ে কত ওঠে কান্না হাসি।
পেয়েও পাইনে তাকে, দূর ডাকা বাঁশি
বেজে চলে। ক্ষমাহীন সময়ের হাত
নিবায় দিনের আলো, ধূ-ধূ করে রাত।
নিরালার দীপশিখা, বিষাদের ছায়া
একাকী আলোয় কাঁপে। জাগে কার মায়া,

প্রহরে প্রহরে তার প্রতীক্ষা দু' চোখে :
চেনা হবে মুখোমুখি মাধুরী আলোকে !
—এ আকাঙ্ক্ষা নদী হয়, স্বপ্ন বুনে মন,
দিনরাত্রি ধন্য হবে ধূলোর জীবন॥

জ্যোতির্ময় দত্ত

নিদারুণ অরণ্যে এসে আমিও আহত !

আমার সর্বদেহে সার্বজনীন হিংসার ক্ষত,
আমার মাংসে বিদ্ধ দেখো তেত্রিশ তীর
আর নীলাভ ছুরির রন্ধ্র দিয়ে যেন সমস্ত শরীর
উপচিয়ে পড়ে। খালি দেহ শূন্য বোতল
এত রক্ত ঝরেছে। শুধু রক্তের হ্রদের বুকে কুয়াশার মতো
যে-যন্ত্রণা ছিলো বৈদেহী, অপরিণত
সে-বেদনা সুগোল ফলের মতো ঝোলে ক্ষতের শাখায়।

যে-ভয় মন্ত্রের সুরের মতো ঘোরে সজারু-শিরায়
বিশুদ্ধ, মদির—ক্ষীর হয় শশক-স্তনেতে দুধ
যে-ভয়ের অস্পষ্ট গুজবমাত্র শুনে,
একই সেই শঙ্কায় বিক্ষত আমার হৃদয়,
ব্যথার ধাতুতে গড়ি নিজের আগুনে
শুধু ব্যথা নয় এমন নতুন চিত্র আশ্চর্য, অদ্ভুত।

গাছের ক্ষত থেকে সোনালি গঁদ যেমন চুঁইয়ে গড়িয়ে প'ড়ে
সোনার কণার মতো শক্ত কঠিন হয় হাওয়ার চুম্বনে,
মহিষের উদরের পাশে যেখানে ব্যাধের তীর
সোজা বিঁধে গিয়ে রক্তের উষ্ণ জরির
দিয়েছে ধূমায়িত ছাপ নিকষ-কালো পাথরের দেহে
মাছির পায়ের কালো দাগ চিনে-অক্ষরের মতো গলিত প্রদাহে

কালশিটে রক্তের ফোঁটার শীতের হাওয়ার অলৌকিক রসায়ণে
চুনির অভঙ্গুর দানা হওয়া, অথবা কাঁটার বনে
কুঁচের ফলের মতো কালোপাথরের বুকের ফোকরে।
সমাজচ্যুত এক দুঃসাহসী নিঃসঙ্গ তীয়র
কোনো অজানা সমুদ্রে সে প্রথম নাবিক, যেন তার পানিতরাস
ছুটিয়ে গিয়ে ফিরে দেখে অনির্বাণ আলোর কাঁকর
নিমেষ-জীবন যার সেই সঠিক আকারহীন সবুজ ফসফোরাস
হয়েছে কোনো মন্তরে।
গিয়েছি অমানচিত্রিত সেই গহন অরণ্যে
সমুদ্রের শান্ত সময়াতীত মেঝের নিঃশব্দ দেশের মতো
মৃত কোনো যূথপতি হস্তীর শূন্য মনে।
অনেক অজানা সমুদ্রে আমার সওদাগরি তুলেছে যদিও পাল
প্রতি যাত্রার শেষে সেই ব্যথার পশরাই এনেছি চিরকাল।

সুপ্ত এক পুরুষের রক্তের নদীতে বিস্মৃত
কোনো পৌরাণিক রমণীর স্মৃতিভেলায় ভেসে এসে,
স্বপ্নের আকারহীন আবর্তিত সমুদ্রে যখন
দুমড়ে যায়, শুধু তক্তা, কাঠ, ছেঁড়া দড়ি ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে
ওঠে আর তলিয়ে যায় তখন ঘুমন্ত মন
ভাসে বুদ্ধির অতীত সেই প্রাগৈতিহাসিক প্লাবনে,
যুক্তির বাড়িঘরের অস্পষ্ট লাল চোখ বহুদূরে,
স্বতন্ত্র স্মৃতির ধার ক্ষ'য়ে গিয়ে সাগর-লবণে
নুড়ির মতো প'ড়ে থাকে। শুধু এক ছবি তুলে আনি,
এমনকি, শৈশবের সমুদ্দুরে
ভোর হয় রক্তিম, জলে যেন সূর্য চোবাই
কিংবা হাঙরের দন্তে যেন তিমিঙ্গিল স্তনের জবাই।

অনুবাদ : **বুদ্ধদেব বসু**

প্লীহা

হাজার বছর যেন বেঁচে আছি, এত স্মৃতি জমেছে আমার।

ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড দেরাজ এক, খোপে-খোপে যার
রয়েছে দলিল, পদ্য, প্রেমপত্র, শস্তা উপন্যাস,
হলুদ রশিদে মোড়া কবেকার দীপ্ত কেশপাশ—
তারও বেশি গুপ্ত এই হৃদয়ের বিষণ্ণ কোটরে।
সে যেন গহ্বর এক, পিরামিড ; বিরাট জঠরে
যত শব চাপা আছে তত কোনো শ্মশানে পোড়ে না।
—আমি এক অন্ধকার গোরস্থান, চাঁদের অচেনা ;
মৃর্ত যেন মনস্তাপ, দীর্ঘায়িত কৃমিরা সেথায়
যে-মৃত আমার প্রিয়, নিত্য তাকে খুঁটে-খুঁটে খায়।
বিবর্ণ গোলাপে ভরা আমি এক জীর্ণ অন্তঃপুর,
সেকেলে কাঁচুলি, জামা ঝুলে আছ বিস্রস্ত, প্রচুর,
আর শুধু করুণ পাস্টেল-চিত্র, দুটি ম্লান বুশে[১]
অন্তঃসারশূন্য এক কবন্ধের গন্ধ নেয় শুষে।

এই খঞ্জ দিবসেরে দীর্ঘতায় কে পারে ছাড়াতে—
যখন, তুষারময় বৎসরের হিমার্ত কারাতে
ব্যাপ্ত হয় নির্বেদ—চেতনারিক্ত জড়ের সন্তান—
ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।
—আজ থেকে, সপ্রাণ পদার্থ, তোর স্বরূপ নিশ্চিত
শুধু এক শিলাখণ্ড, নামহীন ত্রাসে পরিবৃত,

১। Boucher, Francois (১৭০৩-১৭৭০) : ফরাশি চিত্রকর

পুরাতন স্ফিঙ্কস এক সাহারার অস্পষ্ট অকূলে
তন্দ্রায় বিলীন, তাকে উদাসীন বিশ্ব রয় ভুলে,
মানচিত্রে নাম নেই, পাশবিক ভঙ্গিমায় তার
ক্ষণিক সূর্যাস্তরাগে গান গায় শুধু একবার।

প্লীহা

আমি যেন রাজা, যার সারা দেশ বৃষ্টিতে মলিন,
ধনবান, নষ্টশক্তি, যুবা, তবু অতীব প্রবীণ,
শিক্ষকের নমস্কার প্রত্যহ যে দূরে ঠেলে রেখে,
শিকারী কুকুর নিয়ে ক্লান্ত করে নিজেই নিজেকে।
কিছুই দেয় না সুখ— না মৃগয়া, না শ্যেনচালন
না তার অলিন্দতলে মৃতপ্রায় তারই প্রজাগণ।
মনঃপূত বিদূষক গ্রহসনে যত গান গাঁথে
আনত ললাট থেকে রোগচিহ্ন পারে না সরাতে ;
ফুলচিহ্নে আঁকা তার শয্যা, তাও নেয় রূপান্তর
কবরে, এবং নারী, যার জন্য সাজে পুরন্দর
সব রাজা, তারাও জানে না কোন নির্লজ্জ কণ্ডুকে
আমোদ ফোটানো যায় এ-তরুণ কঙ্কালের মুখে !
করেন কাঞ্চনসৃষ্টি, সে-মুনির মেলেনি সন্ধান,
কোন বিষময় দ্রব্যে অহোরাত্রি নষ্ট তার প্রাণ।
এমন কি রক্তস্নান, লিপ্ত যাতে সব ইতিহাস
পুরাতনী রোমকের, অর্বাচীন দস্যুর বিলাস,
তাও এই মূঢ় শবে তাপলেশ পারে না ফেরাতে,
লিথির সবুজ স্রোত—রক্ত নয়—বহে যে-শিরাতে।

বারান্দা

প্রেয়সী, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা,
হে তুমি, সর্বস্ব সুখ, বাসনার সর্বস্ব আমার !
মনে কি পড়ে না সেই সোহাগের স্নিগ্ধ মধুরিমা,
সন্ধ্যার উদার মায়া, অগ্নিকুণ্ডে আতিথ্যবিস্তার,
হে তুমি, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা !

চুল্লির জ্বলনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ !
সন্ধ্যা নামে বারান্দায়, রক্তিম গুণ্ঠনে রমণীয়।
পেলব তোমার বক্ষ, অন্তরে কী অমল কল্যাণ !
কত কথা আমাদের—ধ্বংসহীন, অবিস্মরণীয়—
চুল্লির দহনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ !

কোমল সন্ধ্যার তাপে কী সুন্দর সূর্যের সম্ভার !
কী গভীর অন্তরীক্ষ ! স্ফীত প্রাণ কেমন বিশ্বাসে !
তোমার আননে ঝুঁকে, ওগো রানী, আরাধ্যা আমার,
মনে হয় তোমার শোণিতগন্ধ পেয়েছি নিশ্বাসে।—
সেদিন, সন্ধ্যার তাপে, কী সুন্দর সূর্যের সম্ভার !

নেমে আসে রাত্রি, যেন অবরুদ্ধ অন্দরমহল,
তোমার চোখের তারা অন্ধকারে আমার উদ্ধার,
নিশ্বাসে তোমার ঘ্রাণ—কী মধুর, তীব্র হলাহল।
ঘুমায় আমার হাতে, ভ্রাতৃভাবে, পা দুটি তোমার
যবে রাত্রি নামে, যেন অবরুদ্ধ অন্দরমহল।

জানি আমি মন্ত্র, যাতে আনন্দিত মুহূর্তেরা ফেরে,
আমার অতীত, দেখি, তোমার জানুতে রাখে মাথা,
আর কোথা খুঁজে পাই লাস্যময় তোমার রূপেরে
যদি না তোমারই প্রাণ মোহন তনুতে রয় গাঁথা ?
জানি সেই মন্ত্র, যাতে আনন্দিত মুহূর্তেরা ফেরে !

সেই সব অঙ্গীকার, গন্ধ আর অনন্ত চুম্বন,
অগম্য গহ্বর থেকে আবার কি জন্ম নেবে তারা
অতল সিন্ধুর তলে স্নান ক'রে সূর্যের যৌবন
যেমন নূতন হ'য়ে আকাশের প্রান্তে দেয় সাড়া ?
—হায়, সব অঙ্গীকার, গন্ধ, আর অনন্ত চুম্বন !

নির্বিরোধীর নিবেদন

গোপাল ভৌমিক

যেতে যে চায়, দিয়ো না বাধা ;
কী লাভ ধ'রে রেখে
কিংবা কী লাভ বাসন্তী রঙ মেখে
শীতের ভোরে স্মরণ করা
কচি পাতায় ভরা
শ্যামল সরস গাছ,
এখানে শেষ পাখির নাচ
শুকনো গাঙে কেবল মরা মাছ !

আগুন জ্বলে তবুও, লাগে আঁচ ;
সোনা ছেড়ে যদি সে নেয় কাচ
কীই বা বলার আছে !
বরং তাকে যেতে দিয়ে থাকব আমি কাছে
তাদের, যারা খুশি হয়ে আসে,
থর সাহারা কিংবা স্টেপির ত্রাসে
এড়িয়ে যারা যায় না জীবন-দোলা—
ঢেউ-এর মাথায় নাচে নরম সোলা !

তাই তো আমার দুয়ায় রাখি খোলা ;
সমান সহজ মনে রাখা, ভোলা।
যে খুসি যায়, যে চায় আসে,
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হাসে

নির্বিরোধীর নিবেদন

আলো আঁধার ঝড় বাদলের দেশে—
কাকের সঙ্গে কোকিলকণ্ঠ মেশে।
ঘণ্টা বাজায় তবু যদি স্মৃতির হরকরা
উন্মনা হই, দেখি হৃদয় ব্যথা দিয়েই ভরা।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

না-হয়, শুধু ঘরে ফিরেই ভালোবাসা—
কিন্তু, যেই বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিলো
একলা পথে তুমি অবাক ; অন্ধ মেঘে
এ কী কঠিন দেয়া-নেয়ার ত্রস্ত ভাষা।

পাহাড়ি বাঁক, লোক ছিল না—মনে পড়ে !
বাঁকানো পথ ছোবল হানে দিগন্তকে :
সাফ্রেজিয়া, জেরেনিয়ম, কৃষ্ণচূড়া
অন্ধকারে, বৃষ্টি পড়ে মৃদুস্বরে।

না-হয়, ঘরে ফিরেই শুধু ভালোবাসা।
কিন্তু, যেন সতর্কিতে বৃষ্টি এলো।
পাহাড়ে মেঘ ; একটি চুড়ো ভিজিয়ে দিয়ে
শুকনো রাখে অন্য চূড়া, তোমার বাসা !

পিসিমা

লীলা মজুমদার

ঈস্টারের ছুটি অর্ধেক না কাটতেই রঙ্গনদিদি আবার হস্টেলে ফিরে এলেন। ঘোষ মাসিমা তো অবাক, সঙ্গে-সঙ্গে একটু অসন্তুষ্টও, আবার রোজ সকালে সেই স্নানের ঘর নিয়ে ইত্যাদি।

"সর্বদা বল ভাই, ভাই-বৌ আদর করে, তবে চ'লে এলে কেন বুঝলাম না সত্যি।"

রঙ্গনদিদি কোনো উত্তর না দিয়ে, সুটকেস থেকে কাপড়চোপড় বের ক'রে, কাঁঠাল কাঠের ছোট আলমারিতে থাক থাক ক'রে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন, মুখখানি যেন অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর, শুধু গম্ভীর কেন, বিমর্ষই বলতে হবে। ঝগড়া-টগড়া ক'রে এসেছে বোধহয়। পান থেকে চুন খসলেই তো রঙ্গনদিদির হয়ে গেল ! আলমারি সাজানো দেখেই মানুষটাকে চেনা যায়। এক তাকে থাক্ থাক্ কড়া ক'রে ইস্ত্রি-করা ইস্কুলে যাবার শাড়ি আর জামা। উপরের তাকে কার্ডবোর্ডের বাক্সে ক'রে পাঁচখানি ভালো সাড়ি, ভালো জামা, ভালো রুমাল, ভালো হ্যাণ্ডব্যাগ, ভালো স্যাণ্ডেলটি পর্যন্ত। নীচের তাকে—রঙ্গনদিদি বললেন, "আমার হঠাৎ ফিরে আসাতে কারো কোনোই অসুবিধা হবে না। পথে ক্যান্টিন থেকে এ বেলার জন্য লুচি-তরকারি কিনে এনেছি, ও বেলা আমার চাল নিও।" রঙ্গনদিদির সমস্ত জীবনখানিই এইরকম পরিপাটি ক'রে গুছোনো।

রাত্রে খাবার আগে, স্নান সেরে বারান্দায় চুল শুকুতে শুকুতে আরেকটু ভেঙে বলতে হল। ঘোষ মাসিমা আর কৌতূহল রাখতে পারেন নি। "ভাইপোর খেলনা পছন্দ হল ? ভাইঝির গায়ে জামাটা লাগল ? বৌয়ের জন্য অত খুঁজে খুঁজে মাদ্রাজি মশলা, ঝাল আচার, ডালিমের হজমিগুলি, বড়-মশালিদার বড়ি, কলাই ডালের গোলমরিচের পাঁপর নিয়ে গেলে, তবু মন পেলে না ?"

নিজের চুলে বিলি কাটতে-কাটতে রঙ্গনদিদি বললেন, "বৌ খুবই খুসি

হয়েছিল। টুনির গায়ে ফুকড়ো লেগেছে। নোগির আজকাল আর দমকল ভালো লাগছে না।"

"দু মাস আগেও দমকল ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না, আর এখন দমকল ভালো লাগে না, আচ্ছা ছেলে তো!"

রঙ্গনদিদি একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "আর সে যে কী দারুণ মিথ্যাবাদী হয়ে উঠেছে সে আর কী বলব। দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে। তিনটি দিন তো রইলাম, তারই মধ্যে যত মিথ্যে কথা শুনে এসেছি, জীবনে এমন শুনি নি।"

"কাকে বলে মিছে কথাগুলো?"

"কাকে? সবাইকে, সবাইকে। কাকে বলে না? তিন টাকা দামের দমকলটা পাঁচমিনিটের মধ্যে ভেঙে চুরে সারা। এতটুকু দুঃখ নেই। আমাকে বললে কি না ঐ আমার বন্ধু পাঁচু ভেঙে দিয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, পাঁচু? পাঁচু আবার কে, আগে তো শুনি নি? বললে, আগে তো পাঁচু ছিল না। কোথায় থাকে কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে বলল, বড় পুকুরের ধারে ট্রেনের লাইনের পাশে থাকে, সারাদিন রেলগাড়ি চলা দেখে আর মাছ ধরে। বললাম, মাছ ধরে? বলল রোজ ধরে, এত বড় বড় মাছ, ওর সমান বড়, একটার পেট থেকে এত্ত বড় সোনার আংটি পেয়েছে, তার একশ টাকা দাম। অবাক হয়ে বললাম, কত বড় ছেলে যে অত মাছ ধরে? বলল, আমার বয়স ছ বছর আর ওর বয়স আট, কিন্তু আমার চেয়ে কম পড়ে, যোগ করতে পারে না, রোজ রোজ ভুল করে, মাস্টার মশাই আমাকে বলেন দেখিয়ে দিতে, আমি রোজ ওর অঙ্ক ক'ষে দিই। আমি বললাম, তুমি আবার কত অঙ্ক জানো যে ওকে শেখাবে? বড় দিনের ছুটিতেও তো কিছু পারতে না। বলল, না, এখন পরীদিদির কাছে অঙ্ক শিখেছি। ব'লে টুপ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

রঙ্গনদিদি চুপ করাতে, ঘোষমাসিমা বললেন, "সব মিছে কথা বুঝি?"

"সব মিছে কথা। অঙ্ক কষতে পারে না আরো কিছু! ঠেকায় পড়ে অনেকেই মিছে কথা বলে, কিন্তু ধামোখা এ-রকম মিছে কথা বলা জন্মে দেখিনি। লজ্জাও নেই, বরং একটু যেন গর্বই বোধ করে।

বুঝলে, সেইদিনই বিকেলে একটা আঙুলি দিয়ে গেল আমার হাতে।

বলল, এটা একটু রাখো তো, চিরুনি কিনতে হবে একটা। বললাম, কেন, বড় দিনের সময় যে তোমাকে ভালো চিরুনি কিনে দিলাম সে কি হল? বললে, ও, সেটা? সেটাতে ডাইনিবুনি বিষ মাখিয়ে দিয়েছে তাই ফেলে দিয়েছি। ও আবার কী কথা? ডাইনি বুনি কে? তার কোনো উত্তর না দিয়ে আরো বললে, যাতে বিষ লেগে আমার মাথার সব চুল প'ড়ে যায় তাই মাখিয়ে দিয়েছে। দরজা অবধি গিয়ে ফিরে এসে পকেট থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বের করে বলল, এটাও রাখো, পরে নেব। বললাম এ কে দিল, এতো বাজারের বিশ্রী রঙীন লজঞ্জুষ? বলে কিনা পাঁচু দিয়েছে, ওরা রোজ খায়, ওর বাবা মা এত্ত এত্ত কিনে দেয়, এই খেয়ে খেয়ে ওর দাদার গায়ে কী জোর হয়েছে।

এ কথা বৌকে না বলাটা ঠিক হল কিনা জানি না। তবে জানই ত বৌ লেখাপড়া জানে না, ছেলেপুলের মন বোঝা ওর কর্ম নয়। নিজের মাকে না ব'লে যে কথা পিসিকে এসে বলল সে কথাটা কি ক'রে ব'লে দিই? ছোটবেলা থেকে ও আমার বড়ই ন্যাওটা। কিন্তু দেখলাম একেবারে গোল্লায় গেছে। রাত্রে শোবার সময় বলল, ওসব পরিদের গল্প শুনব না, চোর ডাকাতের গল্প বল। জান তো আমি তা পছন্দ করি না, মন্দলোকের মন্দ কাজের গল্প শুনলেই ও ভাববে ওতে বুঝি ভারি বাহাদুরি, এমন কি শেষ পর্যন্ত ভালো লোককে হয়তো ঘেন্না করতে শিখবে। তা সে কিছুতেই ছাড়বে না। কেন, চুরি ডাকাতি করা খারাপ হবে কেন? জেলে যায়? জেলে গেলে কী হয়? আমার বন্ধু পাঁচু কতবার জেলে গেছে জানো? চার বার। ওর এই বড় বড় ছোরা আছে, একটা ছোট বন্দুক আর তার গুলি আছে, কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখে। কই, পাঁচুর মা বাবা তো কিছু বলেন না। চোরাই মাল দিয়ে পাঁচু কত কী কিনেছে, দুটো খরগোস, মুর্গির বাচ্চা, হলদে হলদে হাঁসের বাচ্চা, আর তিনটে কুকুর। পাঁচুদের বাড়িতে গোরু আছে, ঘোড়া আছে, কাকাতুয়া আছে।

বললাম, চোরাই মাল হবে কেন? ওরা বোধহয় খুব বড়লোক, তাই পারে। বলে কিনা মোটেই বড়লোক নয়, একবার ডাকাতি ক'রে এক থলে মোহর পেয়েছিল, তাই দিয়ে কিনেছে।

বললাম, তা কি কখনো হয় নাকি। তুমি এত আজগুবি কথা কোথা থেকে সংগ্রহ করো?

রাগ ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। মনটা খারাপ হয়ে গেল, জানোই তো ও জন্মে অবধি আমার কত আদরের। তারপর ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমিও ডাকাতি ক'রে কী এনেছি দেখ।' ব'লে সত্যি সত্যি আমার হাতে একজোড়া নতুন সোনার মাকড়ি গুঁজে দিল। কী বলব ভাই, আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল।

"কী সর্বনাশ, এ কোথায় পেলি।" "একটা লোকের কাছ থেকে নিয়েছি।" ব'লে বালিশে মুখ গুঁজে রইল। জোর ক'রে মুখ খুলে বললাম ভালো চাস তো বল্ শিগ্‌গির কি ক'রে পেলি। বলে কিনা কী ক'রে আবার পাবো, পাঁচুদের বাড়ির ছাদে বসেছিল, ছাদের পাঁচিল ছিল না, ওর হাত থেকে কেড়ে নিলাম আর ওকে ঠেলে নিচে ফেলে দিলাম।

"কী সর্বনাশ, মারলি ওকে?"

বললে, "মারবো কেন, মারিনি তো, শুধু ঠেলে নিচে ফেলে দিয়েছি।"

"তারপর তার কী হল, হাত পা ভাঙল?"

নির্বিকারভাবে বলল, "তা জানি না, অত দেখিনি। দাও আমার চোরাই মাল দাও।"

ঘোষ মাসিমা দুই চোখ কপালে তুলে বললেন, "ওমা, কী কাণ্ড!"

রাঙাদিদি বললেন, ও সত্যি সত্যি তখুনি ঘুমিয়ে পড়ল, এতটুকু অনুতাপ নেই। বৌ কি রকম শিক্ষা দিচ্ছে ভেবে পেলাম না। আমার কিন্তু সারারাত ঘুম হল না। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বৌ বললে, "ওকি দিদি, ঘুম হয়নি? শরীর খারাপ করেছে নাকি? ও কী চেহারা হয়েছে?" একেবারে কেঁদে ফেললাম, বাবার বংশধররাই যদি মানুষ না হয়, আমাদের জীবনেরই বা কী মূল্য। বৌয়ের তো চক্ষু চড়কগাছ, এক দৌড়ে গিয়ে ঘুমন্ত ছেলের বালিশের তলা থেকে মাকড়ি টেনে বের ক'রে বললে, "যা ভেবেছি ঠিক তাই। লক্ষ্মীছাড়া কোন ফাঁকে, তোমার জন্য তোমার ভাই নতুন মাকড়ি গড়িয়েছে সেটাকেই সরিয়েছে! স্রেফ হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়, দিদি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

পা দুটো কাঁপছিল, বসে পড়লাম, বললাম, আমার মাকড়ি? ঠিক জানো? ভাই বলল, আমার কোটের পকেটেই ছিল, সেইখান থেকে নিয়েছে ব্যাটা! ওদেরও দিব্যি নিশ্চিন্ত ভাব, বললাম, তা যাই বলো ওকে ঐ

পাঁচুটির কাছ থেকে সরাও দিখিনি, পরে নইলে অনুতাপ করতে হবে। কী সোনার চাঁদ ছেলে ছিল, কী হয়েছে!

ওরা দুজনে একসঙ্গে বলল, পাঁচু? পাঁচু ব'লে তো কেউ নেই, ও ঐরকম বানিয়ে বানিয়ে বলে, একটা স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কি যে করা যায় ভেবে পাই না। পাঁচু না কচু।

ঠিক সেই সময়ে নোগিও ঘুম থেকে উঠে ঘরে এসে হাজির। আর যায় কোথা, বৌ ওর গালে ঠাস ঠাস ক'রে দুই চড় কষে দিল। হতভাগা ছেলে, গুল্ ঝাড়বার জায়গা পাও না! পাঁচুদের বাড়ি থেকে মাকড়ি নিয়েছ না আরো কিছু! পাঁচু ব'লে কেউ আছে, না তার বাড়ি-ঘর আছে?

চড় খেয়ে নোগি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগল, পাঁচুর মা বাবা ওকে কক্ষনো মারে না, তোমরা কেন মারো? পাঁচু যা চায় ওর মা বাবা তাই দেয়। তোমরা কেন কিছু দাও না—

এইটুকু শুনে, ছুটে ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র হাতের কাছে যা পেলাম বাক্স বন্দী ক'রে, রিক্সা ডেকে চলে এলাম।"

ঘোষ মাসিমাও খানিক চুপ ক'রে থেকে বললেন, "যাই, রাঁধাবাড়ার কদ্দূর দেখে আসি গে। ভাগ্যিস্ ছেলেপুলে হয়নি আমার।"

একটি মৃত্যু

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

এক যুগ বুড়াদাকে দেখিনি। এই সহরে চৌমাথায় হঠাৎ সেদিন বুড়াদাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। নোয়াখালীর মফস্বল কলেজের হস্টেলে ওকে যেমন দেখেছিলাম, দেশ ভাগ হবার আগে যেমনটি ওকে মনে করতে পারি বুড়াদার মধ্যে তার কিছু কি রেঁচে নেই?

চৌমাথায় বিলাসী হাওয়া, চৌমাথায় ছিন্নমূল জীবনের ছায়া, সন্ধ্যার সোহাগী আলোয় তার চোখে জ্বালা ধ'রে গিয়েছিল। এই কি বুড়াদার মুখ—এত ক্লান্তি, এত ভয়, ভবিষ্যতের নিলিত বার্ধক্যে সে মুখে এত যন্ত্রণা?

আমাকে ধ'রে নিয়ে গেল, এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে গেল তার বাসায়। নেড়ী কুকুরটা তার পায়ে পায়ে হেঁটেছে, কাছের জারুল গাছটায় ফুল ফুটেছে, আর সে সারাদিন টন টন সিমেন্ট লোহার হিসেব ভেবেছে মনে মনে। তার ঘরের কোণে আলমারীতে পুতুল,—কলের পুতুল, খেলনা, ব্যাগাটলী ক্যারমের বোর্ড রাখা ছিল কটা এক কোণে, আর টেবিলে নীল লাল কাচের শিশিতে নানা কেমিকেল। এই পুতুল, কেমিকেল, সিমেন্ট, নেড়ী কুত্তা, আর এক ঝাঁক পাড়ার ছেলেমেয়ে হয়তো বা বুড়াদার অস্তিত্বের সদর্থ!

—তুই বেশ ভাল আছিস, বিয়ে থা করিস নি তো? বলছিল বুড়াদা।

বুড়াদা গাঢ় উজ্জ্বলতায় দূর থেকে চোখে এক ছবি তুলে নিলে। কি যে উতলা দিন বর্ষালী ডানা মেলে প্রজাপতির মত ভেসে গেল দূর থেকে দূরে। সেই উল্লম্ফনে আমাদের স্মৃতির পাঁপড়ি জড়িয়ে ছিল গুটি পোকার মত, আমাদের কৈশোর কোরক মেলে হঠাৎ সূর্যে বাধা না মানা খেয়ালী হাওয়ায় উল্লসিত প্রজাপতির মৃত্যুর মত হারিয়ে গেছে। বুড়াদা বিয়ে করেছে ওর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেদিন।

আমাকে যখন চা পরিবেশন করলেন বুড়াদার স্ত্রী, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে বুড়াদা—এই আমাদের পুরনো কালের কলেজ দিনের বন্ধু, —বিয়ে করেনি—চিরটা কাল ও যেন ছেলেমানুষই রইবে।

আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—কি রে সংসার অসার ভেবে সন্ন্যাসী হবিনি তো? বুড়াদা দুরন্ত কালের মানুষ। অনেক গল্প বললেন—চোখ ভরা দূরের মিছিল। এক যুগ আগে বুড়াদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সেবার পুজোতে প্রতিবারের ছুটি কাটাতে যেমন মামার বাড়ীতে যেতুম তেমনি গিয়েছি। স্টেশনে পৌঁছুতে ছোটদের কলরব শুনলুম—বুড়াদা শিগ্‌গীর চইলা আইও, পূজা গেলেই আইয়া পইর। তখন নিশুতি রাত। এত রাতেও এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে একটি মানুষকে স্টেশনে বিদায় দিতে এসেছে যে আশ্চর্য বোধ হল। বুড়াদা কেমন মানুষ?

ছোটদের ভীড়ে আমার ভাইবোনদেরও দেখা পেলুম এমন কি আমার মামীমাকে স্টেশনে উপস্থিত দেখে খুশীই হয়েছিল মনটা। ফেনীর সেই মফস্বল সহরে রাত পহরে নির্জন রাস্তা কুলীর ভরসায় একা পেরুতে অতি সাহসীকে ভয় পাওয়াত। বিনা খবরে মামীমা ও ছোট সঙ্গীদের স্টেশনে পেয়ে বড় ভাগ্য মানলুম।

বুড়াদার বরাতেই আমার বরাত যে সেটা বলা বাহুল্য। মামীমার বকুনী শুনলুম—খবর দিয়ে আসতে হয় না? চিঠি লিখলিনা কেন? কলকাতার যাত্রী ট্রেন টাটগা চলেছিল। সবুজ বাতি নড়ল দূরে, বাঁশি বাজল, গাড়ি ছেড়ে গেল। বুড়াদাকে দেখছিলাম—ছেলেমেয়েদের পিঠে কিল মেরে, মেয়েদের বেণী টেনে সবাইকার কথার জবাব দিচ্ছিল। কাউকে উপেক্ষা নয়, সমান পক্ষপাত। গাড়ী ছেড়ে গেলে বুড়াদা ছেলেমেয়েদের কাছে হাত নেড়ে হাসি মুখে বিদায় নিলেন, স্বল্পালোক বুড়াদার মুখ আবেগী উজ্জ্বলতায় মনোরম বেদনায় হারিয়ে গেল।

ছেলেদের রুমাল নাড়ান হাত দোলান—'বুড়াদা' 'বুড়াদা' ব'লে উচ্চরোল স্তিমিত হয়ে গেল।

ওরা কেউ কাঁদছিল, আমার বোন রমুর চোখেও জল দেখেছি।

পথে আসতে মামীমার অভিযোগের উত্তরে বলছিলাম—দেখুন মামীমা চিঠি লিখে আসলে হয়তো বুড়াদার বিদায় দৃশ্যটা আমার দেখাই হ'ত না। বুড়াদার এমন চাক্ষুষ পরিচয় পেতুম? ইতিপূর্বে বোনদের চিঠিতে বুড়াদার মস্ত ভালত্বের উদাহরণ পেয়েছি। সেদিন সারা পথ ছেলেমেয়েরা সেই প্রসঙ্গই শোনালে, রমু বললে—তুমি আর কি মন্টুদা, বুড়াদা কত কিছু জিনিষ এনে দেয় আমাদের জন্য?

আমি কলকাতা থেকে ওদের জন্যে বই উপহার নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বইয়ের চেয়ে টাসেল, চুড়ি, ব্যাডমিন্টন সেট, টর্চলাইট আরও কত কি মূল্যবান উপহার বুড়াদার কাছে পেয়েছে ওরা। তাই বুড়াদার ভালবাসার তুলনা নেই, বুড়াদার ভালত্বের কাছে সবাই বেঁটে খাটো মানুষ।

আমি যে ওদের দাদা হয়েও ওদের মন পাইনি এইটে বুঝেছি আর বুড়াদার মত সকল গুণও আমার ছিল না যে তাইতে প্রচ্ছন্ন দুঃখ হয়েছে মনে।

এই ভালবাসার তুলনা নেই—এই বিদায় ভাষণের বিরহী ভাগ্য আমাকে ঈর্ষাতুর করেছে। বুড়াদাকে বিদায় জানাতে নিশুতি রাত পর্যন্ত সেদিন বাসার ছেলেমেয়েরা জেগে বসেছিল, আর আমি বাসায় পৌঁছেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরদিন সকালে ভাইবোনেদের ডেকে বলেছি—বুড়াদা তোদের কেমন মানুষ রে?

বুড়াদা—রসগোল্লার মত ফিনফিনে চোখ মেলে রমু বলেছে—বুড়াদাকে তোমরা কি জানবে, সে যে কত ভাল, কত সুন্দর! বুড়াদা কোথায় থাকে জান,—সে অনেক দূরের দেশ, দূরদেশে তার ঘর, চারিদিকে সে দেশের জল থৈ থৈ—মধ্যিখানে দ্বীপ। বুড়াদা আমাদের সে দেশের কত গল্প বলেছে।

—কি রকম সে গল্প, আমি প্রশ্ন করেছি, আর অবাক হয়ে রমুর মুখে বুড়াদার দেশের গল্প শুনেছি। ওর বলায় ওর চোখের সেই আশ্চর্য চাউনিতে যেন রহস্যের ইন্দ্রপট অপসারিত হয়েছে।

বুড়াদা যে দ্বীপে থাকে সেখানে সারাদিন সমুদ্র তীরভূমিতে মাতাল ঘোড়ার মত ঢেউ ছুটে বেড়ায়, কালো কেশর ফোলান মস্ত ঘোড়ার দৌড়ের মত ঢেউ আসে আর বালির পেটের মধ্যে হাওয়ার মত মিলিয়ে যায় তারা। নীল পাহাড়ের কোলে, সবুজ গালিচার মত গাছ হাওয়ায় দোলে। গন্ধ বয় অশোক, হরিতকি, বকুল, নাম না জানা ফুলের, দিনের রাঙা ঠোঁটে পাখী গান গায়, রাতের কাল চুলে সমুদ্র মুখ রেখে ঘুমোয়।

যখন মেঘ আসে সমুদ্রের অকূল চোখ জুড়ে, মেঘ উড়ে যায়—সমুদ্র ঠোঁট থেকে বৃষ্টির কান্না লিপিকা বজ্রমে ঝুলিয়ে তাতার ঘোরসোয়াররা যখন দূরে যায়, ত্রিমিকি ত্রিমিকি, গম গম গম্ভীরা ঘণ্টা বাজে মেঘের মাদলে; যেন সে

পথে রাজার দেশের ডাক হরকরা চলেছে। সেখানে পথ ছায়া ধূসর—ভাঙা মেঘের মুখ থেকে রৌদ্র চমকান উজ্জ্বলতায় ডাহুক চিল ডানা মুড়ে থেমে যায়, জলপিপির ঝাঁক, দোয়েল, মেঘের দেয়ালে ঘন্টা বাঁধা মহিষের মত দূরে দাঁড়ায় সন্ধ্যায়। রাত্রির সন্ধিতে সীমাহীন সমুদ্রের একাকারে হঠাৎ বাঁশী বাজে—রাখালের খেয়ালী বাঁশী।

সেই বিপিন নির্জনের নিপুন সুখী মানুষ বুড়াদা। ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড় লেগে থাকে বুড়াদার ঘরে, ছোটদের জগৎ জুড়ে বুড়াদা।

রাত্রি হ'লে দ্বীপের ঘরে ঘরে যখন কেরোসিনের আলো জ্বলে, কাসের গুল্ফে, ঝাউয়ের পাতায় হি হি ক'রে ওঠে হাওয়া, তখন নিলোকে স্তব্ধ ঘাটে বুড়াদার ময়ূরপঙ্খী নাও অনেক দূরের দেশে ভেসে চলে যায়,—ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। ওরা ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখে থেকে থেকে যে দেশের বন্দরে জাহাজের বাঁশী বাজে বুড়াদা সেই বন্দরে চলেছে।

রমুর চোখভরা কল্পলোককে আর একটু উদ্রিক্ত ক'রে আমি বলি—বুড়াদা বুঝি তোমাদের রাজপুত্তুর?

ভোর বেলার চায়ের টেবিলে বাসার সব ছেলে মেয়েরা ভীড় ক'রে আসে। সবাই সমস্বরে বলে—নয়তো কি?

রমু বলে—দেখনি তার রূপোর ঝকঝকে তলোয়ার, দেখনি বুঝি তার হীরা মাণিক গাঁথা মুকুট?

আমি হাসতে হাসতে বলি—তোমাদের বুড়াদা যাত্রার দলের পোষাক চুরি করেছে, সে তো যাত্রার দলের রাজপুত্তুর। বুড়াদার প্রশংসা মুখর কচি সুন্দর ঠোঁটকে স্তব্ধ ক'রে দেই আমার হাস্য প্রয়াসে। কিন্তু বুঝি বুড়াদার প্রতি ওদের ভালবসার কাছে আমার তাচ্ছিল্যের তুণ প্রচণ্ডভাবে প্রতিহত হবেই। রমু চিৎকার ক'রে উঠেছে, মুখ রাঙা, বেণী দুটো সজোরে কাঁধে বুকে আছড়ে পড়েছে ওর যখনই আমি বুড়াদার প্রিয় নাম নিয়ে পরিহাস করেছি, ও বলেছে বুড়াদাকে তোমরা কতটুকু দেখ, কি বা ওর জান? তোমার মত হিংসুক নয় বুড়াদা যাই বলনা কেন।

আমার মনে পড়ছে বুড়াদার এবংবিধপ্রসঙ্গ নিয়ে দুটির দিনে আমার ছোট্ট সঙ্গীরা আমাকে ভয়ংকররূপে হারিয়ে দিচ্ছিল। পরাজিত সেই সব দিনের রোজনামচায় অধিগত অক্ষরের মত এক নিষ্ঠুরা স্মৃতি আমাকে আজও তাড়না

করে। মানুষের মনের যে দুর্বোধ্য আবেগ বুড়াদাকে রাজপুরুষের আসন দিয়েছিল সেইরূপ একটি আসন লাভের অলীক বাসনা আমাকে নিরাশ্বাস করেছে। সেই সব ছেলে মেয়েদের মনে আমার অনাত্মীয়তা অসহ বোধ হয়েছে।

মনে হয়েছে ওদের কাছে আমার প্রয়োজন বুঝি চূড়ান্তরূপে বাতিল হ'য়ে গেছে। একলা আমার কক্ষ, আমার ছায়া, আমার ঘরের আয়না, পরীক্ষার ভাবনা। সকালে এক বাটি চা, ক্ষীর, শিউলির গন্ধ নিয়ে শুরু প্রাত্যহিকতার। বিকেলে হাসপাতালে শ্যাওলা দেয়ালের মুখোমুখি থমকে দাঁড়ান, রাশি নুড়ি বিছানো রেল লাইনের রাস্তা, মফস্বলের মনোহারী দোকানের গন্ধে গা জড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকা, ফুটবল-মাঠে দক্ষিণ কোণে নিমগাছের হলুদ পাতা ঝরান কয়েকটি কাঠবিড়ালীর নিলোক সখ্যতা আমার একাকীত্বকে উন্মাদ ক'রে তুলেছিল।

চিরকালের কিশোর রাজা বুড়াদার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে প্রকৃতির সুন্দরী মুখের চাওয়ায় আমারও যে কত অতিরিক্ত উৎসাহ তা বুঝিনি।

আর একদিন ছুটি শেষ হয় হয় এমনি এক বাদামী দুপুরে বুড়াদাকে ওরা স্টেশন থেকে ধ'রে নিয়ে এল। দেয়ালীর এক ঝাঁক পতঙ্গের মত সেই সব দিন গন্ধকের ধোঁয়ায় মাতাল ছায়ায় চমকাতে থাকল। রাত্রি হ'লে দীপাবলির আলোতে আমি বুড়াদাকে সম্রাটের মুখের মত উদ্ভাসিত হ'তে দেখলুম। সেই কিশোর রাজার জগতে শ্যামা পূজার আগুনের খেলা চলল, অনেক কিশোরী বুড়াদাকে সেই আগুনের লিপিতেই ভালবাসার রাখী তুলে দিয়েছে হাতে। আমি বুড়াদার সঙ্গে পরিচিত হলুম, প্রকৃতির সুন্দরী মুখের চাওয়ায় আমারও ভালবাসা হ'ল। আমিও কিশোরদের সঙ্গে আকাশে সাদা পায়রা উড়িয়ে দিয়েছি, এক ঝাঁক নীল পাখীর পিছনে সাড়া তুলে দৌড়েছি, নৌকো ভাসিয়ে শামুক তুলেছি।

বুড়াদার বয়েস কত? আমার কলেজে পাঠ শেষ হবার বৎসর সেবার, আর বুড়াদা নাকি চতুর্থবার বি. এ. পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। একুনে যতবার সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে ততই সে কৈশোরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে বুড়াদা আমার সমপাঠী হ'লেও আমার বাড়ীর জ্যেষ্ঠতমের সমাসনে তাঁকে ঠাঁই দেওয়া যেত। অথচ কি কমনীয়তা তার যুবক মুখে, চোখে শিশুর

সারল্য, মাথার ঘন চুল স্কুলের ছেলের মত এলোমেলো, পরনে খদ্দরের পাজামা ফতুয়া—এই চেহারা। খিলখিল ক'রে হাসে যেন জলে এক ঝাঁক মরাল হাঁস এল। কথা বলে যেন ক্রিকেটের বলের মত প্রসঙ্গগুলি দুর্নিবার দৌড়তে থাকে। কখনও রাজনীতি, কখনও খেলাধুলা, সবচেয়ে বেশী থিয়েটারে নায়ক হবার উচ্চাশা ওর কথায়। কবে কলকাতায় শিশির ভাদুড়ীকে সে মুখস্ত করেছে তার অভিনয় আমি পুতুলের মত দেখেছি।

প্রকৃতির তো নানা ঋতুতে স্বভাব বদলায়, বসন্তে গাছে ফুল বর্ষায় আকাশে মেঘ স্রোতস্বিনীর উচ্ছলতর প্রবাহ, এতো দেখি, দেখি নবান্নের অপরাহ্নে শীতের রিক্তপ্রান্তর—হলুদ শালিখ চুপি ডানা মুড়ে কখন প্রকৃতির চোখ জুড়ে ঘুম নিয়ে আসে।

বুড়াদারও তাই হয়েছিল, বয়েস নিয়ে ওর হিসেব নেই। সংসারে সবাই তো একদিন রিক্ত হবে—ও জেনেছে হলুদ শালিকের চুপি ডানায় বার্ধক্যের হিম এসে একদা নিশ্চিত সব আলো কেড়ে নেবে, সব উত্তাপ!

কৈশোরে তার স্বপ্নের অবধি ছিল না তাই। যদি সে দক্ষিণ বাতাসে উতলা রাতে আকাশের অপলক তারার দিকে তাকিয়ে বিভোল না হ'ত যদি সেই অন্ধকার মদিরার একলা পাখী তাকে গূঢ় বেদনায় জাগিয়ে না রাখত, নিশীথ পারাবারের উঁচু উঁচু গাছের ঠোঁটে হাওয়ার গান না শুনত সে মফস্বলের হঠাৎ দোতলা কাছাড়ী বাড়ীগুলি পদ্মার নিশ্চল ব্যেটের মত দৃপ্ত ঢেউ না তুলত তার মনে অনেক না বলা গল্পের, তারার চাঁদোয়ার নিচে চকিত প্লেনের নীল অপস্রতি শ্রবণে যদি না তার স্মৃতিকে উচ্চকিত করত তবে সে দিন বদলের বার্দ্ধক্যের পরোয়ানাকে অনায়াসে মেনে নিত। কিন্তু না, বুড়াদা ক্রিকেটে মানকড় নাটকে শিশির ভাদুড়ীকে লক্ষ্য রেখে—দিনান্তের নাটক আগামী দিনেও অভিনয় করেছে।

তার ঘরে একদিন। রমু এসেছে এক পাহাড় আব্দার নিয়ে। মুটফুটে মেয়ে যেন এক তাল পাকা কাঁঠালের মত কাঁচা বয়সের রঙ। বুড়াদার ঘরের জানালায় একটি কলা গাছ মুখ বাড়িয়েছে কিশোরী মেয়ের নিশ্চিন্ত সখ্যতায় সে ও যেন হাত বাড়িয়েছে। বুড়াদা বলেছে—রমি আমার বৌ দেখবি? —তোমাকে আবার কে বিয়ে করল, আর তুমি তো বি. এ.ও পাশ করনি, এই কি তোমার বিয়ের বয়েস?

রমাকে থামিয়ে দিয়ে বুড়াদা বলে—বিয়ের এই তো বয়েস যে বয়সে মনের বিয়েটা কেউ দেখতে পায় না। বুড়াদা একটু থামল, গম্ভীর হ'য়ে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ায় নিবিড় ক'রে তুলল তার কক্ষ।

ইকনমিক্সের বইয়ের পাতায় ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বুড়াদা বলেছে—সবাই যে বিয়ে করে বাবা হয়, মা হয়, ছেলে মানুষ করে আমার বিয়ে তেমন নয়। আমি যে বৌকে ঘরে রাখি তাকে সদাই দেখি—অথচ সংসারে কেউ তার খবর পায় না।

সিগারেটের ছাইগুলি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে রমু বলেছে—তোমার বৌয়ের ঝাঁটা হাতে দিন কাটে বুঝি, নইলে এত ঘরের জঞ্জাল কে ঝাড়ে? কিন্তু তাকে কোথায় লুকিয়েছ আমাদের দেখাও।

বুড়াদা আমাকে উদ্দেশ ক'রে অট্টহাস্যে বলে—এই মেয়েটা আমার বৌ দেখতে চায় বুঝেছিস মন্টু। চল আমার বৌ দেখবি চল। বুড়াদা রঙিন লুঙ্গিটা নিয়ে কলা গাছের পাতার মাথায় ঘোমটা টেনে দেয় আর বলে—অই দেখ বৌ, কচি কলার পাতার রঙ মুখে, বড় লাজুক শান্ত!

—ও তোমার বৌ, হো হো ক'রে হাসে রমা—কি দুঃখ, কি দুঃখ, শেষে কলা বৌ! আমি হাসিতে যোগ দিয়ে বলেছি,—গণেশ ঠাকুরের বৌ তো কলা বৌ, বুড়াদাও তো জানিসনা আমাদের গণেশ ঠাকুর!

বুড়াদার মোমের মত মুখের ত্বকে সাদা হাসি স্নিগ্ধ বেদনায় কেঁপে ওঠে। রূঢ় বুদ্ধির আঘাতে ওর বোধের জগতটা যেন কে ভেঙে দিল। বয়সের তাড়া খেয়ে ভীত পাখীর মত নিজের মনের কুলায় সে মুখ ডুবিয়ে রাখে।

ফুল ফুটানোর অন্তহীন পুনরাবৃত্তি তো একটি গাছের নয়, তার বীজের। বসন্তের খেয়ালী বিলাস যে হাওয়ায় সেখানে রিক্ত দিনের উদাসীও চোখ মেলে। দেহের জড়তা, মনের অবিরত ভাঙাচোরা আয়নায় অস্তিত্বকে একত্র দেখবার মূর্খ সাধ কার বা! কল্পাকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে বুড়াদা সবুজ ছোঁকো আলোয় ঝাঁ ঝাঁ রোদে তাতার হাওয়াকে তবু রাখী পরিয়ে দিতে চেয়েছে। যেন গৃহস্থ ভাবনা নেই, সমাজের পিঠে দায় দায়িত্ব তার কিছু নেই।

সে ভেবেছিল নাটকে সংসারের অসারতাকে অভিনয় ক'রে জীবন কাটিয়ে দেবে—যখন কাঁদবে হাসবে গাইবে, বৈরাগ্যে, আসক্তিতে সামাজিক দায় দায়িত্ব হীনতায়, অত্যাচারে অমিত সাহসী প্রতিবাদে, ভয়ে বিপুল আশায়

প্রেমে, অপ্রেমে, অন্তহীন ব্যর্থতায় সে মানুষী জীবনের অন্তিম বিনাশী পরিণাম থেকে মুখ ফিরিয়েই থাকবে।

বয়েস বাড়ছে উজ্জ্বল হওতো পরিণাম মেন, মনে রেখ এই দেহ বিনাশের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ভূমি, যৌবনের সুন্দর আকাঙ্ক্ষার সমাধি বহন ক'রে তুমি অতীত হতে চলেছ।

দিন যায়। এক বছর দু বছর ক'রে পাঁচ বৎসর অতীত হল। রমুর বিয়ে হয়েছিল। পাঁচ বৎসরে তিনটি সন্তান নিয়ে সে বুড়াদাকে তেমনি ছেলেমানুষ ভেবে তেমনি টান টান হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তার সমুখে। বুড়াদা সেবার বি. এ. পাশ করেছে। জাম ফলের মত কালো কালো চোখ মেলে রমুর অজস্র প্রশ্নের মুখে ওর বুকটা কেঁপেছিল।

—বুড়াদা তুমিও বুড়ো হলে?

—তুই শাশুড়ী হবি?—বুড়াদা বলেছে, একটু হাসির পিঠে যেন কান্নার ছায়া, বুড়াদা ক্ষীণস্বরে বলেছে—পাশ না করাই ভাল ছিল, না রমু? শানকী ঘাটের রূপোলী মাছের আশে, রৌদ্র মেঘের আলো অন্ধকারে কোথায় তারা কৈশোরকে হারাল? রমুর উজ্জ্বলন্ত সিঁদুর লেখা কপালে, বৃষ্টি ধোয়া আকাশের নিরুত্তাপ। এই স্ত্রী, এই মা, এই প্রকৃতি—বুড়াদা বুঝতে পারলে।

আর একদিন সাব জজের সেই এতটুকু মেয়েটা বিলু, যে বুড়াদার সঙ্গে নাটক করতে এসে মাথায় ঘোমটা তুলে বলেছিল—

—দেখতো বুড়াদা তোমার কলা বৌয়ের চেয়ে সত্যকারের বৌ মনে হয় কিনা আমাকে, তাকেও সে দেখেছে বছর না ঘুরতে বৈধব্য নিয়ে ফিরেছিল সে। আরও কত ছেলেমেয়ে তাদের আর চিনতেও পারে না বুড়াদা। সেই সব সোনার প্রতিমা কোথায় তাদের যৌবন হারাল? সেই সব দুরন্ত ছেলেরা কালো কালো বাদুড়ের মত সমস্ত অস্তিত্বে সংসারের দুশ্চিন্তা জড়িয়ে কোথায় অসংখ্য কেরাণী মাষ্টারদের ভীড়ে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল।

তবু বুঝি বুড়াদার লীলা নিকেতনে বয়েসী পাতার হাহাকার ছিল না—চঞ্চল কিশোর কিশোরীরা তাকে ঘিরে থাকে। বিলু বলেছে—বুড়াদা তুমি আর কতদিন এমনি থাকবে, বিয়ে থা করবে না? বিলুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়েছে। বুড়াদা অপলক চোখে তাকিয়ে তাই দেখেছে আর বলেছে

—মেয়ে হয়েছিস, মা হলি, সোনার প্রতিমাখান। ওরা দুঃখের নদীতে বিসর্জ্জন দিলে।

• • • •

এক যুগে বাদে এই সহরের চৌমাথায় বুড়াদার সঙ্গে দেখা হল। সেদিন বুড়াদার মুখে আমাদের কৈশোরের অনেক গল্প শুনলাম।

এই পাথুরে সহরের ভীড়ে এসে বুড়াদা নিজেকে মেলাতে পারেনি, বিয়ে ক'রেও সমাজের হয়নি সে। সিমেন্ট, লোহার ব্যবসা ক'রে দুহাতে টাকা ফুরিয়েছে, অসংখ্য পাড়ার ছেলেমেয়েদের টফি, টাসেল, ক্রিকেট, বল উপহার বিলিয়েছে, জলসা নাটকের সব খরচ একাই চাঁদা দিয়েছে।

বুড়াদার স্ত্রীকে বড় শান্ত মনে হয়েছিল সেদিন, আর তাকে মনে হয়েছিল, স্ত্রীতোদরা আসন্নপ্রসবা হয়তো বা। চলে আসবার সময়ে বুড়াদা বললেন ছোটদের নিয়ে নাটক করছি দেখতে এস।

নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। অস্থায়ী স্টেজ বাঁধা হয়েছিল অপেশাদারী পটুত্ব তার গায়ে। ফেনীর সেই সব ছেলেমেয়েরা যারা সংসারী হয়েছে তাদের অনেককে সেই নাটকের আসরে দেখলুম। বুড়াদার নিজেরই লেখা নাটক সেদিন অভিনীত হচ্ছিল। আমার সঙ্গে আমার বোন রমু তার ছেলেমেয়েরা বসেছিল।

বুড়াদা বৃদ্ধের বেশে মঞ্চে এলেন, আশ্চর্য ছেলেমেয়েরা তাকে চিনতে পেরেছিল, আনন্দে হাত তালি দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠেছিল—'বুড়া মামা। বুড়া মামা!'

আমাদের ছোটবেলার বুড়াদাকে মনে পড়ছিল। যিশুখৃষ্টের মত বুড়াদা শিশুদের নিষ্পাপ মুখকে ভালবেসেছে, সতত তাদের সঙ্গে রেখেছে। কৈশোরের অপাপবিদ্ধ মনকে সে হারায় নি। সেই অকারণে খুসী হওয়া, প্রান্তরের বনাউ দেউদার শাল পিয়ালের ঐকতানে, হরিয়াল ডাহুকের ডাকে বার বার ফিরে চাওয়া, নিস্তরঙ্গ দুপুরে ছায়াস্তব্ধ পথের ইসারায়, বাঁশের ঝাড়ে, পুকুরের জলে—রেল লাইনের ধারে হঠাৎ যেন কার চেনা চোখের আলো আমাদের চমকে দেয়।

বুড়াদা বৃদ্ধের অভিনয় করছিল—সে বললে যখন প্রতিভার জড়তা আসে, মনের বৈকল্য ঘটে,—যৌবনের প্রতিবন্ধকতায়, সুখ স্ত্রী কাতরতায় আকাশের

আলো মরে যায়, প্রেমের অবসান ঘটে। হঠাৎ নীল কেমিকেলের শিশিটা নিয়ে চিৎকার ক'রে বললে—যারা প্রকৃতিকে ভালবাসেনি তারা তাকে এই কাচের বদ্ধ শিশির মধ্যে আটকেছে। আমি সেই রুদ্ধ, ক্ষীণ দৃষ্টি, চলতা রহিত, প্রকৃতির পরমাণু ছিনিয়ে নিতে উন্মাদ হয়েছি আমি। এই পরমাণু দিয়ে পৃথিবীর সকল যাদুকে মৃত্যু এনে দেবার ভাবনা চোখের আলো কেড়ে নিয়েছে। এই কালো হাওয়া আমার ঘুম কেড়েছে। একটু নিস্তব্ধতা। তারপর বুড়াদা বললে কিন্তু যে প্রেমিক কৃষ্ণের রাধালিয়া বাঁশী শুনেছে তো সে—সে জানে আছে মুক্তি আছে। সেই বিরহীর সুরে দূরে বাঁশী বাজে। নীল গগন ছাওয়া, ঘোড়সোওয়ারের বল্লমে যারা সূর্যকে গেঁথে নিয়ে যায়, জলজল রৌদ্রে, মেঘে যার ঐরাবত শুঁড় উঁচিয়ে চন্দ্রলেখাকে নিয়ে চলে মাথায়, মৃত্তিকার বিরহে যার চোখে জল পড়ে, সমুদ্রের স্বাদে যে আদিগন্ত মাটির সঙ্গে আড়ি ক'রে দূরযাত্রায় মাতে, পাহাড়ে সেই উমার বক্ষ নিয়ুষে বুক জুড়িয়ে থাকে যার তুষারে, সবুজে যার হাওয়া ফুলের থালিমা ভরে দেয় সুধায়, যার ডাক শুনে সংসারে সবাই সুখী, না শুনে অপার দুঃখী তারই চরণ চিহ্ন দেখি লেখা আছে কিশোর কালে। হে পথিক বিদায় নেবার আগে ক্ষণিকের অবকাশ নিয়ে যাও এখানে।—বুড়াদা বলছিল—আমাকে তোমরা কি একটুক্ষণের জন্য সেখানে নিয়ে যাবে? আমিও যে তার গান শুনেছি। স্টেজের আলো নিভে গেছে। বৃদ্ধের মৃত্যু হল। (কী ভয়ংকর) অভিনয় করতে করতে নীল শিশির কেমিকেল নিজেই গলধঃকরণ করেছিল বুড়াদা।

অভিনয় অভিনয় থাকেনি আর সেদিন। ছেলেমেয়েরা স্তম্ভিত হয়ে বাড়ী ফিরলে। হারানো জীবনের মত বুড়াদার দেহাধারে যে দ্বীপ জলছিল উজ্জ্বল হাওয়ায় তা নিভে গেল।

সেই বৃদ্ধকে দেখে এলাম—যার বার্দ্ধক্য অনিবার্য ছিল, অসুখের মত ছায়াময় লীলাচঞ্চল অজস্র সবুজ পাতার মত বুড়াদার জীবনের কথাগুলি কালের হাওয়ায় ঝরে গেল, উত্তরকালে নশ্বর ব্যাপ্তিহীন বোধে আমাদের যৌবরাজ্যে আমরা কোনও দিন ফিরানে যে সেই কথা বুড়াদার মৃত্যুর স্থির প্রতিজ্ঞার মত আমাদের মমতা কেড়ে নিয়েছে।

বলিষ্ঠ প্রেম

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামীর উক্তি

আমি শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মিত্র, বয়স ছিয়াত্তর বৎসর। সরকারের নয়, গভর্মেণ্টের বড় চাকরি করতাম; উপস্থিত বছর কুড়িক ধ'রে মাসিক সাড়ে শাত শ' টাকা পেন্সন পেয়ে আসছি। আমাদের সময়ে আমাদের বিহারী চাকরেরা আমাদের সরকার ব'লে সম্বোধন করত।

আমার যাবার সময় আসন্ন; ডিসট্যাণ্ট সিগনাল ডাউন হয়েছে, হোম সিগনালও পড়-পড়। রেলওয়ের ভাষা ব্যবহার করছি ব'লে আমাকে মধুপুর অথবা শিমুলতলার যাত্রী ব'লে কেউ যেন ভুল না করেন। আমি হচ্ছি সুদূরের যাত্রী, যে সুদূর থেকে ফিরে আসবার টিকিট পাওয়া যায় না। দস্তুর মতো ওয়ান-ওয়ে ট্র্যাফিক।

আমার মতো যাঁরা নাস্তিক নন তাঁরা বলবেন, ওয়ান-ওয়ে ট্র্যাফিক নয়, ডবল লাইনই পাতা আছে,—সুদূরের দিক থেকেও গাড়ি আসে। তাঁদের কথার প্রামাণ্য স্বরূপ তাঁরা গীতার সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত করবেন,—নাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়। কিন্তু যারা আমার মতো বিশ্বাসের সরস ভূমিতে বাস করে না, উপলব্ধির কঠিন ভূমিতেও উপনীত হ'তে পারে নি, তাদের পক্ষে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সুবৃহৎ খাতার চৌহদ্দির মধ্যেই হিসেব করা উচিত।

আমার স্ত্রী বিনোদিনী আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট, সুতরাং সাধারণ বাঙালী স্ত্রীলোকের হিসেবে তাঁর বয়সও কম হয় নি। আমাদের দুজনের শরীরের মধ্যে নানা ব্যাধির আশ্রয়। সুতরাং মনে হয়, দুজনের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির কার্যকারিতার ফলে যে-কোনো মুহূর্তে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।

জীবন-প্রান্তরের সুদীর্ঘ পথ নানা সুখ-দুঃখ, ঝড়-ঝাপটা, আলো-ছায়া, হর্ষ-বিষাদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম ক'রে দুজনের সঙ্গে দুজনে এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি যে, বিচ্ছেদের কথা মনে ভেবে মনের একটা শির সর্বদা টনটন করে। যা হবেই হবে তা সইতেও হবে,—এই নীতি মনের মধ্যে প্রকট ক'রে মনটাকে

একটা ধূসর বৈরাগ্যে আচ্ছন্ন ক'রে রাখি।

মাঝে মাঝে বিনোদিনীকে একটু তালিম দেবার চেষ্টা করি। বলি, দেখ একটু প্রস্তুত হওয়া ভাল।

কথাটা কতকটা অনুমান ক'রে বিনোদিনী প্রশ্ন করেন, কিসের প্রস্তুত?

এই ধর, মানুষের জীবনের কথা তো কিছুই বলা যায় না,—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিনোদিনী বলেন, মানুষের জীবনের কথা তো আমাদের কি?

উত্তর দিই, আমাদেরও কিছু বটেই। তুমি না হয় মেয়েমানুষ, কিন্তু আমিও তো অমানুষ নই,—সুতরাং মানুষের জীবনের কথা আমাদের জীবনেও কিছু কিছু খাটে।

যুক্তিতে পরাস্ত হ'য়ে বিনোদিনী বললেন, কি বলতে চাও বল।

বলতে চাই বয়স আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট হয়েছে, স্বাস্থ্যও আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট খারাপ। এরূপ অবস্থায় ছাড়াছাড়ির সময় যদি কাছিয়ে এসে থাকে তাহ'লে বিস্মিত হবার কিছুই হয়নি। সুতরাং যে দুঃখ অনিবার্য তার জন্যে একটু প্রস্তুত থাকা উচিত।

তা বেশ তো, তুমি প্রস্তুত থাক না।

তুমি থাকবে না?

না।

কেন?

কারণ যে দুঃখের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হবার জন্য তুমি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ, সে দুঃখ তো তোমাকেই পেতে হবে; আমি তো তার আগে ড্যাঙড্যাঙিয়ে চ'লে যাব।

কিন্তু তারও আগে আমিও ড্যাঙড্যাঙাতে পারি বিনু। মৃত্যু তো হিসেব করা ব্যাপার নয়। আজ রাত্রেই তো আমার—

এবারও বিনোদিনী আমার কথা শেষ হ'তে দিলেন না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, দেখ, যখন-তখন যা-তা কথা বলতে নেই। ব'লে ও আলোচনা আর নিরাপদ নয় মনে ক'রে সবেগে প্রস্থান করলেন।

বিনোদিনীর একেবারে পুরোদস্তুর শশকপদ্ধতি। শশক যেমন শুধু তার মুখটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে মনে করে তার আক্রমণকারীর হাত থেকে

দেহটাও নিরাপদ হয়েছে, বিনোদিনীও তেমনি মনে করেন, আমার মৃত্যুর কথা তিনি বিস্মৃত হ'য়ে থাকলে কৃতান্তও বিস্মৃত হ'য়ে থাকবে।

কয়েক দিন পরে বিনোদিনী অসুস্থ হলেন।

প্রথমে দু-চার দিন মনে হয়েছিল সোজা অসুখ, সহজেই সেরে যাবে ; কিন্তু দেখতে দেখতে কিডনি সংক্রান্ত ব্যাধি এমন রুদ্র মূর্তি ধারণ করলে যে, আমরা আত্মীয়বর্গ ই শুধু নই, ডাক্তাররাও ভীত হয়ে উঠলেন।

আরও উচ্চ ফি-এর আরও নামজাদা ডাক্তার আনা হ'ল ; কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না। দিন চার-পাঁচ পরে তিনি আমাকে বললেন, দেখুন আমাদের চিকিৎসা যখন তেমন কিছু respond করছে না, তখন আমার মনে হয় চিকিৎসান্তর করা ভাল।

আমি বললাম, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আমার স্ত্রীর আর কোনও আশা নেই ?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, দেখুন, আশা নেই আমরা সহজে বলিনে, কারণ সময়ে সময়ে অপ্রত্যাশিতও ঘটে। আপনাদের মতো আমরাও 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' কথাটা মানি।

বুঝলাম।

অন্তরাল থেকে আমরা জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ কুন্তলা আমাদের কথোপকথন শুনেছিলেন। ডাক্তাররা প্রস্থান করলে তিনি বললেন, মার এখন কোন্ চিকিৎসা করাবেন বাবা ? হোমিওপ্যাথিক, না কবিরাজী ?

বললাম, গোলাপ আর মল্লিকা এই দুই ফুলের মধ্যে যে কোন একটার নাম কর।

বউমা বললেন, মল্লিকা।

তা হ'লে হোমিওপ্যাথীই করাব। এখন তোমার মার পক্ষে হোমিওপ্যাথী আর কবিরাজী দুই-ই সমান, কোনো ইতর-বিশেষ নেই।

মিনতিসূচক কণ্ঠে বউমা বললেন, তাহ'লে বাবা, আপনি যদি অনুমতি করেন, জ্যোতিষতীর্থ মশায়কে ডাকিয়ে পাঠাই !

কে জ্যোতিষতীর্থ মশায় ?

শ্রীপতি জ্যোতিষতীর্থ, গণনার কাজ করেন, শান্তি-স্বস্ত্যয়নও করেন। ভারি নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। আমার বাপের বাড়িতে দরকার হ'লে ওঁকে দিয়ে স্বস্ত্যয়ন করানো হয় ; এ পর্যন্ত একবারও নিষ্ফল হ'তে হয় নি।

তোমার মার চিকিৎসার দোষ ও ত্রুটি হয়েছে ব'লে কি তোমার মনে হয় বউমা ?

ব্যস্ত হ'য়ে ঘাড় নেড়ে বউমা বললেন, না বাবা, তা আমার একটুও মনে হয় না। কলকাতায় সর্বশ্রেষ্ঠ যে চিকিৎসা হ'তে পারে তা আপনি মার জন্যে করিয়েছেন।

আচ্ছা, সে চিকিৎসা যদি তোমার মাকে রক্ষা করতে না পারে, তোমার শ্রীপতি জ্যোতিষতীর্থ তা পারবেন ব'লে তুমি বিশ্বাস কর ?

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে কি চিন্তা ক'রে বউমা বললেন, অবিশ্বাসও করিনে বাবা। পরীক্ষা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ?

না, কোনো ক্ষতি নেই। ডাকিয়ে পাঠাও তাঁকে। পরীক্ষা যখন করছ ভাল ক'রেই কর। টাকার যখন যা দরকার হবে, আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো। কিন্তু একটা কথা যদি বলি, ভুল বুঝবেনা তো বউমা ?

কি কথা বলুন ?

কি ভাবে কথাটা বললে ঠিক বোঝার পক্ষে সকলের চেয়ে কম অসুবিধে হবে তাই একটু ভেবে নিয়ে বললাম, তোমার মাকে ধ'রে রাখবার জন্যে আমরা সব রকম চেষ্টা-চরিত্র তো করলাম ; বাকি যতটুকু করবার আছে তা-ও করব। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি উনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যান, তাতে আমাদের সকলের পক্ষে যত ক্ষোভেরই কারণ হোক না কেন, ওঁর পক্ষে বোধ হয় ভালই হয়।

কেন ?

দেখ, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। শরীরও ভালো নয়, আমি থাকতে থাকতে তোমার মা যদি সসম্মানে চলে যান, সেটা বিবেচনার দিক থেকে বোধহয় ভালই হয়। দেখ বউমা, বাপ-মাই বল, আর ছেলে-মেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীই বল, স্ত্রীলোকের পথে স্বামীর মতো আর কেউ আপনার নয়। স্বামীর কাছে স্ত্রীলোকের যেরকম জোর-জুলুম দাবি-দাওয়া চলে, এমন আর কারও কাছে চলে না। বল, ঠিক কি-না।

একটু ইতস্তত ক'রে বউমা বললেন, তা হয়তো ঠিক। আপনি আর মা দুজনেই আরও বহুদিন ধ'রে আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকুন, সেই প্রার্থনা করি ; কিন্তু বাবা, আপনার পাঁচ ছেলের মধ্যে কেউ-ই তো ভয় পাবার মতো নয় ?

ব্যগ্রকণ্ঠে বল্‌লাম, না, না, ছেলেদের আমি ভয় করছিনে ; আমি ভয় করছি ভবিষ্যৎকে। কাল ভারি অনিশ্চিত জিনিষ ; আজ যে-কাল বর্তমান আছে, কাল তা থাকে না। ভাগের মা গঙ্গা পায় না, সে প্রবাদ ত আধুনিক কালের নয়, প্রাচীন কাল থেকে চ'লে আসছে। আমি তোমার মাকে ভাগের মা হবার risk দিতে চাইনে। ভারি অভিমানী মানুষ, চিরকাল সদর্পে রব-রোয়াবে কাটিয়েছেন ; কোথায় কার ভুল-ভ্রান্তিতে আগেকার দিনের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন, সেই ভয়ই করি। তাই ব'লে আমাকে ভুল বুঝোনা বউমা, তোমার মার প্রতি আমার আকর্ষণ নিন্দে করবার মতো কম নয়।

আমার কথা শুনে শিউরে উঠে বউমা বললেন, সে ভুল আমি একটুও করছিনে বাবা! আমি শুধু ভাবছি, মার মতো স্বামী-সৌভাগ্য সকল স্ত্রীলোকের যদি হোত!

বললাম, তা হ'লে তুমি জ্যোতিষতীর্থ মশায়কে আনাবার ব্যবস্থা কর, আমিও একজন ভাল হোমিওপ্যাথকে কল্ দিই। সময় আমাদের হাতে বেশি নেই।

২

স্ত্রীর উক্তি

যমের সিংহদ্বার থেকে ফিরে এলাম।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারটির আত্মপ্রসাদের অন্ত নেই,—কলিকাতার তিন-চারজন বিচক্ষণ অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার রোগীহননের অপযশ এড়াবার জন্য যে মৃতকল্পা রোগিনীকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করেছিলেন, তাকে যিনি সারিয়ে তুলেছেন।

এদিকে জ্যোতিষতীর্থ মশায়ের আচরণ একেবারে আস্ফালন-বর্জিত। যদি বলা যায়, পনেরো দিন ধ'রে প্রত্যহ ষোড়শোপচারে নারায়ণ পুজোর পর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে এক শ আটটি চন্দনলিপ্ত তুলসীপাতা একটির পর একটি ক'রে নারায়ণ পিতার উপর স্থাপিত করার পুণ্যে আমি আরোগ্যলাভ করেছি, যুক্তকর ঊর্ধ্বোত্তোলিত ক'রে তিনি বলেন, নারায়ণ! নারায়ণ!

আমার ধ্রুব বিশ্বাস, হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের গুণে নয়, তুলসীদানের ফলে আমি আরোগ্যলাভ করেছি। বউমা, মেজবউমা, সেজবউমা প্রভৃতিরও সেই একই বিশ্বাস।

ওঁর কি বিশ্বাস জানবার জন্যে একদিন ওঁকে চেপে ধরেছিলাম। ধরা-ছোঁয়া দেবার পাত্র ত নয় ; বলেছিলেন, যে তুলসীদানের পরে তুমি সেরে উঠেছ সে তুলসীদানের পাতা যদি থাকে আমাকে একটি দিয়ো, আমি মাথায় রাখব।

উত্তরে বলেছিলাম, কি মানুষ গো তুমি! 'যে তুলসীদানের পরে' বলছ! তবু বলবে না 'যে তুলসীদানের জোরে'?

হাসিমুখে উনি বলেছিলেন, যতটুকুর প্রমাণ পেয়েছি, ততটুকুই ত শ্রদ্ধাভরে মাথায় রাখা চলে বিনু।

কথায় ওঁর সঙ্গে পেরে ওঠা দায়!

অন্নপথ্য পাওয়ার পরে একদিন ওঁর কাছে অনুযোগ করছিলাম, বেশ তো ড্যাঙড্যাঙিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, তুমি ও-সব অন্তরের সঙ্গে মানো না, তবে কেন বউমার তুলসী দেওয়ার পরামর্শে রাজি হ'লে?

উনি বললেন, আমি মানি আর না মানি, তুমি তো মানো। ধর, বছর দশেক পরেই যদি ড্যাঙড্যাঙিয়ে চ'লে যাও, তাতে তো লাভ বই লোকসান হবে না।

ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাকে রেখে তো?

হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমাকে রেখে। আমাকে না রেখে গেলে ড্যাঙড্যাঙাবে কিসের ওপর?

খুসি হ'য়ে বললাম, পথে এস! তাহ'লে মত বদলাতে আরম্ভ করেছে ত?

আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রথম মন্তব্যের উত্তর দিলেন : বললেন, তোমার পথে আমি চিরদিনই তো আছি বিনু, নতুন ক'রে আর কি আসব?

ভারি কঠিন মানুষ ; ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না।

উনি বললেন বছর দশেক পরের কথা। আমি এবার দিন পাঁচেক পরের কথা বলি।

তখন বেলা নটা সাড়ে নটা। পুবদিকের জানলা দিয়ে আলোকের বন্যা এসে সারা ঘরটা ভাসিয়ে দিয়েছে। দূরে পথের ধারের শিরিষ গাছের ডালে ব'সে একটা সবুজ রঙের পাখী নিরবসর শিস্ দিয়ে চলেছে। উনি আমার পালঙ্কে ব'সে প্রসন্ন মনে গল্প করছেন। হঠাৎ এক সময়ে বুক চেপে ধ'রে বললেন, উঃ! ভারি ব্যথা ধরল বিনু!

ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে বললাম, শুয়ে পড়। ও ফিক ব্যথা, একটু হাত বুলিয়ে দিলে সেরে যাবে।

উনি ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন; আমি ওঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, একটু কম বোধ হচ্ছে?

ঘাড় নেড়ে বললেন, বড় কষ্ট!

ছেলেরা ডাক্তার ডাকতে ছুটল।

আবার মাথা নিচু ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, চুপ ক'রে রয়েছ, একটু আরাম বোধ হচ্ছে কি?

কোনো উত্তর দিলেন না।

মিনিট পনের পরে ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে যে মনোভাব প্রকাশ করলেন, তাতে ওঁর বুক থেকে হাত তুলে নিয়ে আমার বুক চাপড়ানোর কথা।···উনি চ'লে গেছেন।

দুঃখ ত চিরজীবনের জন্য রইল; উপস্থিত এ লজ্জা রাখি কোথায়? আমাকে জীবিত রেখে উনি তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন, জ্যোতিষতীর্থ মশায়কে ডাকাবার সময় পর্যন্ত দিলেন না।

কয়েকদিন পরে বউমাকে কঠিন ভাবে ভর্ৎসিত করলাম। বললাম, বউমা, আমার এ দুর্দশার জন্যে দায়ী তুমি। জ্যোতিষতীর্থ মশায়কে ডাকিয়ে তুমি যদি আমাকে বাঁচিয়ে না তুলতে তাহ'লে এ দুঃসহ কষ্ট আমাকে ভোগ করতে হ'ত না।

বউমা কিছু বললেন না, ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মাস ছয়েক বিচ্ছেদ বেদনা ভোগ করবার পর কিন্তু মত বদলালাম।

বউমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে বললাম, শোকের প্রথম অবস্থায় জিনিসটা ঠিক ধরতে না পেরে তোমাকে ভর্ৎসনা ক'রে অন্যায় করেছিলাম বউমা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

বউমা বললেন, সে কি মা! এমন কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না।

বললাম, না বউমা, জ্যোতিষতীর্থ মশায়কে ডাকিয়ে তুলসীদান ক'রে আমাকে বাঁচিয়ে ভালোই করেছিলে; নইলে যে দুঃখ আমি ভোগ করছি সেই

দুঃখ তো তাঁকে ভোগ করতে হ'ত। তিনি গেছেন, আমি আছি, সেইটেই ভাল হয়েছে।···কিন্তু তাই ব'লে আমাকে ভুল বুঝে মনে কোরোনা বউমা, জীবনের প্রতি মমতার জন্যে আমি একথা বলছি।

যেদিন ভর্ৎসনা করেছিলাম, সেদিন বউমা চুপ ক'রে ছিলেন। আজ ক্ষমা চাওয়ার দিনে চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না,—দুই চক্ষু হ'তে একরাশ অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

চলনদার

অমরেন্দ্র ঘোষ

দশ বিশখানা গাঁয়ের ভেতর কারুর কখনো একখানা চিঠি এলে, সে এক ইলাহি কাণ্ড! একদিন সেই চিঠিই আসে সাহেরবানুর কাছে। ফয়গম্বরের ওক্তো সকালবেলা—সবে সোনামুখি আলো পড়েছে আসমানের জমিনে সাহেরবানু সবে মুক্ত ক'রে দিয়েছে তার নয়ালী হাঁস মোরগ, তখন একখানা চিঠি।

মাথার আঁচলটা একটু টেনে সে অস্ফুটে বলে, বসেন মিঞা।

মিঞাটি পিওন নয়, পরদেশি—এখন পত্র বাহক। সাহেরবানু রাজি হ'লে ভবিষ্যতে চলনদার। একখানা নতুন গাব-খাওয়ানো ডোঙা এনেছে। সাহেরবানু একবার নায়ের চালিতে পা দিলে, সে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে বৈঠার ঘায়—এমন হিম্মৎ সে রাখে। এবং এই বুঝেই চাঁদবিবি তাকে পাঠিয়েছে। চলনদারটির নাম সেলিম। কবে কোন জন্মে সে দিল্লির ওক্ত হাউসে বসেছিল, সে ইতিহাস আজ আর তার জানা নেই। উনিশ শ' পঞ্চাশের স্বাধীন দুনিয়ায় সে চাঁদবিবিদের ঠিকা কিষাণ। জমিতে জল, হাল চলে না—তাই এখন সে এই গিমতলীর গাঁয়ে, এমনি বেগার দেওয়া এ দেশের প্রথা। সেলিম শেষ রাত্রে বিরক্ত হয়ে রওনা দিয়েছিল। এখন মজে যায় সাহেরবানুর আপ্যায়ণে, অথচ যে আসনে সে বসবে, তা উঠোনে নেই।

সেলিম ইতস্তত করতে থাকে। সাহেরবানু সরমে রাঙা হয়ে ওঠে। সম্মুখেই ছনের ছাউনি মেটে ঘর। সাহেরবানু একখানা হাতে বোনা হেউলি পাতার নরম মাদুর বিছিয়ে দেয় শুকনো খটখটে মেঝেতে। অপরিচিত সমবয়সী পুরুষ। যদিও বা একটু ছোট, এর সঙ্গে বেশি কথা বলা সংগত নয়। সাহেরবানু ঘরের ভেতর চলে যায়। চিঠিখানা তার হাতে।

সেলিম এগিয়ে যায়। হাতের জোর-বৈঠা ডোয়ার ঘিঁসে রাখে মাটিতে পুঁতে। আবার ইতস্তত। পায়ে কাদা, কি ক'রে সে উঠবে দাওয়ায়?

কোথায় ঘাট, কোথায় জল—এ বাড়ির সে তো কোনো হদিশই জানে না। সেলিম অসহায় ভাবে তাকায়। কিন্তু দুয়ারের পর্দা নড়ে না। কাপড়ের পাড় যেন শক্ত হয়ে থাকে।

ছোবান আল্লা! এ কেমন কুটুম্বের মেয়ে? কতক্ষণ যে সে এক ছিলিম তামাক পর্যন্ত খায়নি। এত পরিশ্রমের পর এখন লেগেছে আবার বড় এক সান্‌কি মেটে বাসন পান্তাভাতের খিধে।

সাহেরবানু কুটুম্বিনী নয় ঠিক—চাঁদবিবির বন্ধু। ছোটবেলায় এক পাঠশালায় পড়েছে দুজনে। ধান কুড়িয়েছে এক মাঠে, ফুল কুড়িয়েছে এক বাগিচায়। কিন্তু বিয়ের পর গেছে দুটো নদীর মত আলাদা হয়ে। চিঠি তো নয়, ছোট্ট একখানা চিরকুট হাতে দিয়ে সেলিমকে বলেছে আদ্যপান্ত ইতিহাস চাঁদবিবি। 'বোঝলা তো ওরে সাথে কইরা লইয়া আসা চাই। ও না আইলে আমার মোতালেপের জন্মজ্জেবই মিছা। মিঞার (স্বামীর) তরফের কুটুম্ব অনেক আইছুব, ও ছাড়া আমার দিকের কিন্তু কেও নাই। বাপের ভিটা তো যমের দোয়ায় ফর্সা।' চাঁদবিবির গলা ধরে আসে।

সেলিম বলে, 'বোঝলাম, এট্টু লেইখা দ্যাও মাতব্বরের বৌ। সে তো আমারে চেনে না, আমিও চিনি না সেই বিবি সাহেবারে। এট্টু কালির পরিচিতি দিয়া দ্যাও নাকি।' 'ঐ যে দিলাম চিঠি।' চাঁদবিবি ধানের বড় মোড়াইটা ছাড়িয়ে এগিয়ে আসে। 'হারাইলা?'

'না, আমি ভাবছিলাম চিরকুট খান হাটের ফর্দা।'

হ্যাঁ হাটের ফর্দাই বটে! এতবড় গৃহস্থের ঘরে কিনা একখণ্ড ভাল কাগজ নেই। তাও আবার লিখেছে একটা বাঁশের কলম দিয়ে। কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং অক্ষর।

সেলিম হাসে।

'তুমি হইছ পয়লা নম্বর বেকুফ।' চাঁদবিবি রেগে ওঠে। 'তোমারে দিয়া কোনো কাম হইবে না। এমন দাওয়াতের (নিমন্ত্রণের) পত্তরখানারে কও কিনা ফর্দা। চিঠি লাগে কিসে? আমি তো সব কইছি—মায় ওর রূপগুণ দেহের গড়ন। এখনো কি চেনবা না? কোন্ পোতায় ঘর তাও কি কই নাই?'

'কইছ তো সবই, কিন্তু পূর্ণিমার উজান পানি, সেই জন্যই তো এট্টু চিন্তা করি।'

'আবার আসার সময় তুর্‌তইরা ভাঁটা সে কথা ভাবনি।'

সেলিম একটু চুপ ক'রে থাকে।

চাঁদবিবি একটু যেন ঝাঁপড়ে পড়ে। এ উজানে সত্যই অন্য কেউ যেতে রাজি হবে না। হলে তো একখানা কেরায়ার নৌকাই পাঠান যেত। সেলিনের মত শক্ত বাইছা অস্বীকার করলে সর্বনাশ। চাঁদবিবি ঠিকা মজুরীর বাইরেও কবুল করে কিছু ইনাম বকশিস।

চাঁদবিবি আবার সখেদে বলতে সুরু করে বিগত দিনের কথা। এক সময়ই নাকি ওদের বিয়ে হয়েছিল বিভিন্ন গ্রামে। চাঁদবিবি ঘর সংসারে মন বসাতে পারলে, কিন্তু সাহেরবানু এলো রাগ ক'রে চলে। বড্ড দেমাকী মেয়ে। তাই বনিবনা হল না স্বামীর সঙ্গে। তালাক দেবে না, ও হট্‌-হুজ্জৎ ক'রে তালাকনামা আদায় ক'রে নিলে।

একবার চাঁদবিবি দেখা হলে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ব্যাপার কি ?'

'এক্কেবারে কসাই রে চাঁদ, কসাই। তিন তিনটা বৌ। বলে কিনা হপ্তায় তিন আষ্টে চব্বিশ কাঠি ধান ভাইনা দেবা—তয় ভাল খোরাকী, নয় একবেলা গরম, অন্য বেলা পানিভাত। বল তো চাঁদ আমরা কি কেনা বান্দী ?'

এরপর পড়েছিল নাকি এক মিলিটারীর ভাঁওতায়। সেটা বদমেজাজি মাতাল। বহু কষ্টে তারও খপ্পর ছাড়িয়েছে সাহেরবানু। কিন্তু ওর মনে সুখ নেই। এখন হয়েছে আবার পিতৃমাতৃহীন।

'তুমি এট্টু নজর করলেই দেখবা সেলিম, ও কেমন নিপুণ সোংসারী। কিন্তু খোদা দেছে ওর নসিব বোঝাই ছাই। আমার ও ঘরের ভাস্তুর পো লেখাপড়া শেখছে, যদি একটা হিল্লা করা যায়।'

মুখখানা শুকিয়ে যায় সেলিমের। 'বিবি সাহেবা রাজি হইবে তো ?'

'পথে বইসা তুমি এট্টু, গুনগুন্ কইরো, এখানে আইলে আমি আছি। একটা জিন্দা জীবন বেফয়দা যাইবে, একি সওয়া যায়।'

সেলিম একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলেছে, 'ঠিক কইছ মাতব্বরের বৌ—একটা জিন্দা যে সে কথা লয়। কারোর যায় অভাবে, কারোর স্বভাবে। বিসমিল্লা!'

'শ্যাষ রাইতে রওনা দেবা তো ?'

'কইতে পারি না, উজানে পানি। তয় একবার ডাইকা দিও।'

সারারাত ধরে ভেবেছে সেলিম। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। তিলও একটি বসিয়েছে সে আনাড়ি চাষাড়ে হাতে, যা হয়ত ওর গালে নেই। অবশেষে চাঁদবিবি ডাকা মাত্র সে সাড়া দিয়েছে। তবে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে এমন মধুর স্বপ্নটা ভেঙে যাওয়ার দরুন।

সেলিম ঠিকা কৃষাণ। আজ আছে এখানে—নইলে হয়ত অন্য কোনো গ্রাম গঞ্জে। ভদ্রাসনে তার বসত ঘরখানা পর্যন্ত নেই। তার রাগ বা বিরক্ত হওয়া সাজে না। এমনি সময়-অসময় বেগার দেওয়া তাদের অদৃষ্ট। এখন চাঁদবিবি তার মালিক। সে যেমন স্বপ্ন জাগিয়েছে, তেমনি ভেঙে দিয়েছে তার মর্জি মত।

অতএব সেলিম মিছিমিছিই এক অপরিচিতা পর্দানসিনার গালে তিল বসিয়েছে। ঠিকা কৃষাণের রুদ্ধ আবেগে বুক ফেটে যেতে চায়।

তবু সেলিম বৈঠা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। তার ভেতরের সহানুভূতি কেমন যেন সপাং ক'রে চালিয়েছে চাবুক—ওরে তাড়াতাড়ি রওনা দে, একটা জিন্দা যে বেফয়দা হয়ে যায়!

পথের উজান পানি সে অনায়াসে ঠেলে এসেছে। কিন্তু এখন দেখে যে উঁচু দাওয়ায় ওঠা বড্ড মুস্কিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সেলিম। খালের কাদা পায় শুকিয়ে আসে। তবু কারুর দেখা নেই।

চাঁদ বিবি বলেছিল, 'যদি আইতে না চায়, এট্টু, সাইধা-ভাইজা দেইখো। পত্তরে তো এত কথা লেখা যায় না—তুমি আমার হইয়া মুখে কইও। পুরুষ মানুষ, নাইলে হাতে পা ধরতে বইলা দিতাম।'

সেলিম সাবালক হয়েছে। হাত দিলে গোঁফের পত্তনও বোঝা যায় নতুন ধানের চারার মত। সে যা হক একটা কিছু বুঝে-সুজেই করত। কিন্তু সুরুতেই যে খেই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কি নিজেকে এত পরিশ্রান্ত লাগছে ?

বিবি সাহেবা ভালই আছেন। তাই দেমাক দেখিয়ে দু'ছটো দড়ি কেটেছেন। ছবেদালী তাহেবদালীর ঘরের মেয়ে হলে এ মুরদ সাহস দেখা যেত না।

সে চেয়ে দেখে উঠোনে বাঁধা রয়েছে একটা নয়া বিয়ানের দামী গাই। গেরালের গাদাটাও বেশ জমকালো। তবে ধানও হয় প্রচুর। মটকি বোঝাই নিশ্চয়ই আছে পুরান সরু বালাম চাল। অভাবের মধ্যে, কারুর সঙ্গে মিল হল না—তাই দিলে সুখ নেই।

যদি এই উৎসবে গিয়ে চাঁদ বিবির ভাসুরপোর ওপর নজর পড়ে, সে তো বাদশা।

সেলিমের পায়ের কাদা চড়চড় ক'রে ওঠে। সে এবার একটা নিশ্বাস ফেলে—হায়রে দুনিয়া!

যার জন্য চাঁদবিবি সুপারিশ করতে চাইছে, সে-ও যে মানুষ না! তার সঙ্গে একবার মধুগঞ্জে গিয়েছিল সেলিম। সেবার মেলা বসেছিল যেন কি পর্ব উপলক্ষে। সেই ভাসুরপোটি সারা রাত ইয়ার বন্ধু নিয়ে যেখানে কাটিয়েছিল তা ব্যক্ত করার নয়। তোবা! তোবা! সেলিম আজ হলফ ক'রে বললেও চাঁদ বিবি বিশ্বাস করবে না। বরং তার একদিনের পরিশ্রমের মজুরী নিয়ে করবে দারুণ গণ্ডগোল। কারণ আখের চাইতো নিমের দাঁতন মজার নয়।

নিজের স্বার্থেই তাকে চুপ ক'রে থাকতে হবে। এবং এভাবে যে কতক্ষণ কাটে সেলিম জানে না। কাঁধে কলস, হাতে বদনা, মাথায় ঘোমটা—সাহেরবানু উঠানের মাঝ বরাবর এসে দাঁড়ায়। আর একটু এগিয়ে বদনাটা রাখে সেলিমের কাছে নামিয়ে। তারপর দাওয়ায় উঠে ঘরের ভেতর হারিয়ে যায়। হুঁশ হলে সেলিম চেয়ে দেখে, জলছবি আর নেই।

চার চোখে দেখা হওয়া মাত্র ভুল ক'রেই হয়ত বিবিসাহেবা বসতে বলেছিল। তেমনি আবার ভুল করেই সেলিমকে পাঠিয়েছে চাঁদবিবি। যার সঙ্গে কথা বলতে বারণ, এমন পর পুরুষের সঙ্গে সাহেরবানু কিছুতেই নায়ে উঠবে না। পায়ে ধরে কেঁদে মরলেও না। এখন আর সেলিম ছোটটি নেই। এ সব তলিয়ে বুঝেই এত ঘাম ঝরানো উচিত ছিল। তার মাথাটা যেন রিমঝিম করে।

সেলিম কোনো রকমে পা ধুয়ে দাওয়ায় ওঠে। একখানা দুধের ফেনার মত তোয়ালে এসে পড়ে আড়াল থেকে। এ দিয়ে সে করবে কি? পা মুছবে, না মাথায় তুলে রাখবে? এমন বিপদেও পড়ল চাঁদবিবির হুকুমে এসে! মাতব্বরের বৌ ভালমানুষ না।

অনেক ভেবে চিন্তে ছোবান আল্লা ব'লে, সেলিম পা মোছে। একটু কাদা লাগে শাদা ঝালরে। এখন উপায়? সে ভাঁজ ক'রে দূরে সরিয়ে রেখে তবে সুস্থ হয়।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে সুস্থ থাকতে পারে না। পেটটা দাউ দাউ করে নাস্তার আশায়। শরীরটা বেতাল ঠেকে তামাকের পিপাসায়। এই জন্যই চ্যুনা বলে। সেলিম নিজেকে ধমকায় চোখ রাঙিয়ে, 'বেটা অভদ্দর!'

একটা বকনা বাছুর ছুটে আসে উঠানে, যেন মাখনের মত তকতকে, বেশ খানিকটা দুধ চাটে, তারপর সাহেরবানু হাজির হয় মেটে বড় খোরা নিয়ে। অবলীলাক্রমে দুধ দুইয়ে গরুটাকে ছেড়ে দেয় মাঠের দিকে। ফর্সা মেয়ের পরনে এখন নীলডুরী। শাড়ি দেখবে, না রং দেখবে, না মুখ দেখবে গুলিয়ে ফেলে সেলিম। দুধ নিয়ে সাহেরবানু পেছনের দিকে চলে যায়। শূন্য উঠানে থেকে যায় একটা শুধু জৌলসের বাহার।

এ বিবি কি তার সঙ্গে যাবে?

কেমন ঝকঝকে উঠানখানা! সতেজ বর্দ্ধিষ্ণু নারকেল সুপারি বাগ! চোখ ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাকালে। এর মালিকানা যে কার কিসমতে আছে! সেলিমের বুকটা একটু পুড়ে পুড়ে ওঠে। যে পাওয়ার সে শুধু বাগ বাগিচা বাড়ি ঘর পাবে না—সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি যৌতুক পাবে যার তুলনা মেলা ভার। শুধু দেখতে নয়—কাজে কর্মে মানে ইজ্জতে।

সেলিম উঠে দাঁড়ায়। নরম হোগলা আর ভাল লাগে না। প্রাণ গেল তামাকের জন্য। সে হেঁটে বেড়ায় একটু। খুলে ফেলে গায়ের কোর্তা, মাথার টুপি।

কাঠের নল লাগান একটা সদ্য মাজা নিকেলের ফর্সি আসে। আড়াল থেকে দুখানা চুড়ি পৈছি পরা হাত তা ঠেলে দেয়। ধোঁয়া উড়ছে, সুগন্ধে ম-ম করছে। শুধু তামাকের না, ফুলেল তেল মাখা চুলের।

একজন বুড়োও আসে ভেতর থেকে। হয়ত প্রতিবেশী। বলে, 'তামাক ইচ্ছা করেন সাহেব।'

'সে কি? আপনে পেরসাদ কইরা আন।'

'দেছে আমার নাতনী। আয় তো এইদিকে।' বুড়ো কার যেন হাত ধরে টানে। সেলিমের বুকটা ধক ক'রে ওঠে।

না—একটি ছ সাত বছরের রাঙা মেয়ে।

'এইডিও আমার নাতনী—সাহেরবানুও। একটি কচি, আর একটি যুবতী। কিন্তু কচিটির তাল বেশি। এর ফরমাস জোগাইতে জোগাইতে আমি বেতাল হইয়া গেছি।'

মেয়েটি এসে মুখ চেপে ধরে।

'না, না, আর কিছু কমু না। ছাইড়া দ্যাও, কসুর হইছে ছোট বিবি'—এর মধ্যে চৌকাঠে টোকা পড়ে। আবার সুগন্ধ আসে ফুলেল তেলের। বুড়ো ভেতরে চলে যায় ছোট্ট নাতিটিকে নিয়ে। ফিসফাস কথা। একটু যেন রঙ্গ-রসের হাসি।

সেলিম উগ্র কৌতূহলে কান পেতে থাকে। যাবে কি যাবে না এ বিবি তার সঙ্গে? কিন্তু কিছু সে বুঝতে পারে না। তার ইচ্ছা করে শাণিত ল্যাজার ফালার মত মুলিবাঁশের বেড়া ভেদ ক'রে ভেতরে গিয়ে ঢুকতে।

নাস্তা আসে নানা কিসিম (রকম)। গরম দুধ, নয়া পাটালি, রুটিপিঠা এক দিস্তা, আরো কত কি। তার আগে আসে ডাবর গ্লাসে সুগন্ধি পানি। দেখেশুনে হকচকিয়ে যায় কৃষাণ সেলিম। তার জীবনে এমন আতিথ্য সে কল্পনাই করেনি। খাবে কি, তার বুক ভরে যায় এক অব্যক্ত আনন্দ ও ব্যথায়। সত্যিই সাহেরবানু বড় মানুষের ঝি।

আবার টোকা পড়ে ভেতর দিকে—মেয়েলি নখের ইসারা।

সেলিম বাঁকা চোখে তাকায়। কিন্তু কিছু দেখা যায় না।

ভেতর থেকে ঘুরে এসে বুড়ো বলে, 'আপনে চাঁন্দের গ্যাঙের মানুষ, মেজাজ ঠাণ্ডা কইরা যান। এট্টু দেরী হইছে দেইখা গোস্তাফি মাপ করবেন। সাহেরবানু একা এক হাতে পাইরা ওঠে নাই।'

'কি যে কন মিঞা!' বলতে বলতে সেলিমই যেন লজ্জায় মরে যায়। 'আসেন আপনেও আসেন—আসো তুমিও কচি বিবিজান।'

'না, না, না।' বুড়ো বাধা দেয়।

কিন্তু কে শোনে নিষেধ? সেলিম ওদের হাত ধরে বসায়। পোষা বিড়ালটা ঘুরে ঘুরে মিঁউ মিঁউ করে। কচি মেয়েটি ওকে কোলে তুলে নেয়। 'সবুর।'

এবার আরো জিনিষ আসে ভেতর থেকে। চুড়ি পৈছির চমক—কাচে কাচে সংগত। পর্দাটাও সরে যায় বার কয়েক, সেলিমের মনের তিলটি দেখে যে নিটোল মুখখানিতে আশ্চর্যভাবে বসান।

বুড়ো বলে, 'তা যাইবে মেজবানে (নিমন্ত্রণে), আপত্তি কি, একটু কষ্ট হইলেও আমি না হয় সাথে যামু। কি বলেন সাহেব?'

সেলিম এক সঙ্গে তিনখানা রুটিতে কামড় দিয়ে মহা উৎসাহে জবাব দেয়, 'হু।'

'কিন্তু আমার তো দাওয়াৎ নাই।' বুড়ো হাসে।

সেলিম বলে, 'কেডা কইছে—পত্তর পড়েন নাই?'

বুড়ো বকলম। তবু গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, 'পড়ছি। সাহেরবানু কইছে সব।'

'তবে আপত্তিডা কি?'

'কিছু না। আপনেও তো আমার নাতীর বয়সী। এট্টু মসকরা করলাম।'

এত সহজে যে এত বড় একটা কঠিন প্রশ্ন মীমাংসা হবে, তা ভাবতেই পারেনি সেলিম। সে গোগ্রাসে খেতে থাকে, এবং এমনভাবে সব চেটে-চুটে সাবাড় করে যে পোষা বিড়ালটার জন্যও সান্‌কিতে কিছু থাকে না।

সকালের খানা খেতে বেলা প্রায় দেড় প্রহর। দুপুরেরটা শেষ হয় অপরাহ্ণে। তারপর গোছ-গাছ সাজসজ্জা। কেবল ঝুমুর ঝুমুর টুং টাং চুড়ি পৈছি বাজে। সেলিম অতিষ্ঠ হয়ে যায়। বুড়োকে সে বারবার বলে, 'রাইত হইবে যে!'

বুড়ো ঘরে ঢোকে। সাহেরবানুর মুখের কথা সেলিমকে এসে বলে, 'জোনাক রাইত, ভয় কি? তাতে আবার গড়গইড়া ভাঁটা।'

উজান হলেও ভয় ছিল না সেলিমের। এমন জব্বর খানা খেলে দু-দশ বাঁক গুণ টানতেই বা কি! কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে যে তার প্রলুব্ধ মন সাহেরবানুকে নগ্ন আলোতে দেখতে চায়। দিনের আলো নিবে গেলে তা কি আর সম্ভব হবে? যত চকচকে জ্যোৎস্নাই হক তিলটি কি আর দেখাবে?

মাঠ থেকে চরে গরুটি উঠানে এসে জাবর কাটছে। বাছুরটি রয়েছে মার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে। সেলিম নিচে নেমে ওদের গায় হাত বুলায়। চাষার ছেলের এ বড় ভাল লাগে। একটু বাদে মা মেয়ে কার ইসারায় যেন খিড়কীর

পথে চলে যায়। এরপর হাঁস মোরগ এসে খোপে ঢোকে। সাহেরবানু আসে না। সেই কচি মেয়েটি এসে খোপের আগল টেনে দেয়।

সেলিম হাঁকে, 'বেইল যায় বুড়া মিঞা।'

বুড়ো আবার ভেতরে ঢোকে। ফিরে এসে বলে, 'উপায় নাই নাতি সাহেব, গেরস্থর তো ঘর দুয়ার এট্টু গুছাইয়া জিম্মা কইরা দিয়া যাইতে হইবে।'

একটু লজ্জা পায় সেলিম। এসব তার বোঝা উচিত ছিল আগেই। সে বুঝবে কি? চালচুলো দায়িত্বের বালাই নেই কিছু!

অবশেষে রাত হয়। জ্যোৎস্না ঝরে আকাশে বাতাসে গাছপালার অঙ্গে অঙ্গে।

সুর্মা ওড়না গন্ধে গৌরবে যে বিবি গিয়ে তার নায়ের চালিতে বসে, সে যেন সাহেরবানু নয়—এক হুরি। এতক্ষণ ছিল ঘরে সংসারে মিশে, এখন যেন সেলিমের একান্তই নাগালের বাইরে। কাছে থাকলেও যেন বেহেস্তের সিঁড়িতে সরে বসেছে।

বৈঠা দিয়ে জল চিড়ে চিড়ে সেলিম বাঁকের পর বাঁক ছাড়ায়, তবু যেন সে স্বস্থ হতে পারে না। এ উপঢৌকন সে কোন শয়তানের জন্য নিয়ে যাচ্ছে?

সাহেরবানু তো রয়েছে বিপরীত দিকে। কিন্তু সে তো জানে না—তার পরম হিতার্থী একজন কিছু বলতে চায় মুখোমুখি বসে। কোনো আবেদন নিবেদন নয়—শুধু একটু উপদেশ। রাহুতে গ্রাস করবে, তাই একটু হুঁসিয়ারি। 'ভুল কইরা ফান্দে পা দিও না বিবিজান। যেখানে যা চকমকায় সব কিন্তু জহরৎ লয় রূপসী। ছাইয়ের গাদায়ও কিন্তু থাকে সোনার দানা।'

কিছুই বলার সুযোগ হয় না সেলিমের। নৌকা ভাঁটিয়ে চলে বিদ্যুৎ গতিতে। বৈঠার চাইতেও স্রোতের টান সাংঘাতিক।

আবার মাঝখানে রয়েছে বুড়োটি বসে। সারাদিন বেশ ভালই লেগেছে। কিন্তু এখন মনে হয় যেন অপ্রয় একটি জীব কিম্ভুত কিমাকার।

হাতের বৈঠা একটু ঢিমিয়ে আসে সেলিমের।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করে, 'অম্বল হইছে নাকি—আমার কিন্তু গলা বুক জ্বলে।'

সেলিম একটু কড়া জবাব দেয়, 'অম্বল হইবে কোন দুঃখে—আমার তো বয়েস হয় নাই পাঁচ কুড়ি।'

বুড়ো বলে, 'গোসা হন ক্যান? রোগ কি হয় ক্যাবল বুড়া গো?'

সেলিম আর কোন জবাব দেয় না।

কূলে পাড়ে ঘন গাছপালার মাথায় শুধু জ্যোৎস্না। চাঁদ যেন গ'লে গেছে আজ। জল ঝলমল, ওড়না ঝলমল—মাঝে মাঝে টলমল করছে এক বিবিজান ছোট নায়ে ভারসাম্য সামলাতে। তার গোলাপী মখমলের জামার সঙ্গে মিশে গেছে গায়ের রং। বিশ্বাস হয় না সেলিমের যে-এর দুখানা হাত আজ সারাদিন ওকে খানা খিদমৎ (সেবা) জুগিয়েছে। কিন্তু এখন তা হ'লে কেন নীরব হয়ে ব'সে রয়েছে?

এ-জ্যোৎস্না মদির রাত্রে কিছু কি করণীয় নেই?

সুরা সরাপ ওর চৌদ্দ পুরুষে কেউ খায়নি। বাদশা সাকীর কেচ্ছা হয়ত কখনো দু একটা শুনেছে। কিন্তু কল্‌কি আগুন ফসিটা তো গলুইতে রয়েছে। একটু তামাক সেজে দিলে দোষ কি? 'বিবিজান তুমি কি ভুলে গেলে সগ্‌গে গেলেও ঢেঁকিতে ধান ভানে?'

সেলিমের মনের কথা কেউ কান পেতে শোনে না।

নৌকা এগিয়ে চলে গন্তব্যে। এমন ভাঁটার টান যে উলটো টানলেও নাও দাঁড়াবে না। পথ তো ফুরিয়ে এলো প্রায়।

সেলিম লক্ষ্য করে একটু ঝিম আসে কিনা বুড়ো মিঞার; নদীর জলো হাওয়ায় তা একান্ত আসা উচিত। উঁহুঁ—কেবল আই ঢাই করছে। হয়তো অম্বল এখন ব্যথায় পরিণত হয়েছে। এরপর হয়তো চালিতে শুয়ে চিৎকার—ছটফটানি।

একটা বৈঠার ঘা মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে সেলিমের। আহা, এ সব কি শয়তানী বুদ্ধি? সেলিম আবার নিজেকে ধিক্‌কার দেয়—হুঁশিয়ার অসংযমী।

নৌকা ছোট খালে ঢোকে। তারপর সোঁতা খাল—আরো ছোট। দু পারের ঝাপসা গাছপালায় এবার আলো আঁধার হ'য়ে আসে। সাহেরবানু জড়ির চটি খোঁজে। ওড়না সামলায় শেষ বারের মত ডানা বিস্তার ক'রে। আর সময় নেই। কিন্তু বুড়ো যে জাগ্রত।

ডে লাইটের রোশনাই দেখা যায় চাঁদ বিবিদের বাড়িতে। এক একটা ছোট্ট বাঁক ঘোরে আর প্রাণ কেঁদে ওঠে সেলিমের। অপারিবাগের ভেতর দিয়ে পথ।

নৌকা এসে নির্দিষ্ট ঘাটে থামে। অল্প খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। বুড়ো একটু পিছিয়ে পড়ে।

এগিয়ে গিয়ে সেলিম সবিনয়ে ডাকে, 'বিবি সাহেবা ?'

সাহেববানু একটু চমকে থামে। এর মধ্যেই চাঁদবিবি দল বল নিয়ে হাজির হয়। একটু পরেই হরবা হাসি আলোর মিছিলে মিশে যায় সাহেববানু।

সেলিমের কথা অন্ধকার বাগিচায় নীরব হ'য়েই থাকে।

চৈত্রের পর

মৃণাল চৌধুরী

আজো দেখা হ'য়ে গেলো।

কাল মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল ছাতার আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। কিন্তু দেখা হ'য়ে গেলো। মুখোমুখি। পুরো এক রশির দূরত্ব নেই মাঝখানে। মিহির যাচ্ছে কলেজে আর সুলতা ফিরছে টুইশান সেরে। দেখেই হাসি ছড়িয়ে পড়লো মিহিরের চোখে। টোল খেল গালে।

আর কি আশ্চর্য, হাসিতে আর লজ্জায় মিশিয়ে সুলতার মুখখানাও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাতব্যাগে আয়না নিয়ে বেরুলে দেখে নিতে পারতো নিজের মুখশ্রী। পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হ'লে অজান্তেই একটু হাসি ছড়িয়ে পড়ে মুখেচোখে। কিন্তু সে হাসিতে এমন ক'রে কর্ণমূল পর্যন্ত শিহরণ পৌঁছয় না।

ত্রিশ ধরো ধরো সুলতা রায়ের অজানা নয় এ কথা।

শকুন্তলা বিদ্যাবীথির এ্যাসিষ্টান্ট টিচার সে। উপর ক্লাশের কিশোরী অনেকের মুখেচোখে দেখেছে এ হাসির ছোপ লেগেছে। সতর্কবাণী শুনিয়েছে সুলতা। এমন হাসির জোয়ার এসেছিল আগে একবার। পুড়ে খাক হয়ে বেঁচে আছে। আগের কালের নায়িকাদের পরিণতি—মৃত্যুনীলঅবসান।

তবু মিহিরকে দেখলে হাসি ছড়িয়ে পড়ে মুখেচোখে। শিহরণ পৌঁছোয় কর্ণমূল অবধি। এ দুর্বলতা সমস্ত বিশ্ব থেকে গোপন করা যায়। কিন্তু নিজের কাছে ?

কাল ভেবে রেখেছিল ছাতার আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। দু'চারদিন এমনি ক'রে যাবে। তারপর পাড়ি জমাবে নতুন এক শহরে। আর এক স্কুলে কথা প্রায় পাকা হ'য়ে গেছে।

এ ছাড়া পথ নেই। কলকাতার উপর মায়া পড়ে গিয়েছিল। সে শেকড় যখন উপড়োনো গেছে এখানকার তিন বছরের মায়া কাটানো এমন কিছু অসম্ভব নয়। এখানে মিহিরের সংগে দেখা হবেই। এ কলকাতা নয়।

নিতান্তই মফস্বল শহর। হাল আমলে কলেজ হয়েছে। পুব-বাঙলা থেকে অনেক মানুষ এসে জমায়। মেয়ে-স্কুল অর্থাৎ শকুন্তলা বিদ্যাবীথির বয়স মোটে দশ বছর। বাস-ট্রামের ভীড় নেই। নেই এ পথ ব্যবহার না ক'রে অন্য পথ ব্যবহার করার সুযোগ। শহরের একমাত্র সড়ক ভদ্রজনের সুষ্ঠু ব্যবহারের। এখানে থাকলে এই পীচঢালা পথে সুলতা ফিরবে টুইশ্যান সেরে আর মিহির যাবে কলেজে। দেখা হবেই।

এক বছর হতে চললো মিহির এসেছে এখানে।

এর তার মুখে শুনেছে। শুনেছে ওর রূপ বর্ণনা। ঝাকড়া চুল, কালো টানা টানা চোখ। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। শ্যামল-সুন্দর। সাহিত্যের ভাষায় কবি-মূর্তির জীবন্ত প্রতিনিধি। বাংলার শিক্ষিকা শ্যামলীর বর্ণনা শুনে মনে মনে হেসেছে সুলতা।—হায় ভগবান! এরা জানে না মিহির সত্যিই কবি। বাংলা কাব্য জগতে এক ডাকে চিনে ফেলবার মতো নাম।

উচিত ছিল মিহিরের সংগে গিয়ে আলাপ করা। যায়নি। স্থানীয় অনেক অনুষ্ঠানে ঘোষিত হয়েছে প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক মিহির সান্ন্যালের নাম। সুলতা যায়নি। বাইরের ফাংশন তো দূরের কথা নিজেদের সোস্যালে গর-হাজির থাকে সুলতা। দেখা করা হয়নি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও।

চৈত্রের রুক্ষতায় খাক হ'য়ে গেছে সে। মিহিরের অজানা নয় কিছুই। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মতো মনের জোর কোথায়?

তবু, দেখা হয়ে গেছে পথে। দুজনের দুদিকের কাজের শুরু আর শেষের সময়। দূর থেকে দেখে চিনেছে সুলতা। ডাকেনি। নিজেকে শাসন করবার বিদ্যেতে গত তিন বছরে পাকা হ'য়ে গেছে সে।

তবু এড়ানো যায়নি।

এগিয়ে এসেছে মিহির—'আরে সুলতা যে!'

বিস্ময়ের ভাণ করেছে সে-ও—'মিহির! উঃ, কতোদিন পরে দেখা হলো! সেই পরীক্ষার বছর শেষ দেখা। পরীক্ষার ছ'মাস আগে যে উধাও হ'লে আর আজ দেখা হ'লো।'

মিহির অধ্যাপক হয়েছে। তা ছাড়া আর পরিবর্তন হয়নি। ঠিক আগের মতোই প্রাণখোলা সরল আলাপী। বেশী সময় দূরত্ব বজায় রাখা দায়।

সেদিন নিজের হষ্টেলে ওকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে কিংবা আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সুলতা বলে—'যাই, স্কুলের বেলা হলো।'

'ঠিক তো। আমাকেও আজকে ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাশ নিতে হবে।'

সেদিন এই পর্যন্ত।

তারপর আবার দেখা হয়েছে। আলাপ এগিয়েছে। পরিচয় আজকের নয়। মিহির ডেকেছে তার বাসায়। ভদ্রতার খাতিরে গিয়েছিল একদিন। নিজের দিক থেকে এতটুকু উৎসাহ দেয়নি সুলতা। নিজেকে শাসনে সে দক্ষ।

কিন্তু, মনের অগোচর কিছু নেই। মিহিরের সংগে দেখা না হলে ফাঁকা লাগে। রবিবারটা মনে হয় অনাবশ্যক দীর্ঘ।

গতকাল অনুযোগ করেছে মিহির—'চিরকাল এক মুখো বয় না স্রোত। সুলতা কোন সাইকোলজিষ্টের সাহায্য নাও।'

কথাগুলোর অর্থ পরিষ্কার। দু'রকম জবাব এর। এক মিহিরকে সাবধান ক'রে দেওয়া—'ভুল করছো, আর এগিও না। আর নইলে 'সাইকোলজিষ্ট' মিহিরের সাহায্য-প্রার্থনা।'

কোন পথই গ্রহণ করা হয়নি। মিহির ভুল করছে না। ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার অবধি সেই দিনগুলির পর আবার সাম্প্রতিকের যোগ হ'লে তার মতো সুস্থ-চিত্ত মানুষ এমনি ক'রেই এগোয়।

কিন্তু সুলতা? সারারাত বিছানায় ছটফটিয়ে সিদ্ধান্ত করেছে ছাতার আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। দু'চারদিন, তারপর এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পাড়ি জমাবে মিহির-হীন অন্য কোথাও।

তার আগেই আবার আজকে বেলা সাড়ে ন'টায় মফস্বল শহরের পীচঢালা পথে দূর থেকে নজরে পড়লো অধ্যাপক মিহির সান্ন্যাল আসছে। অকারণে কিনা কে জানে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো মন।

মিহির এলো বক্ষের দুয়ারে আথালপাথাল ঢেউ তুলে, তন্তুতে শিহরণ এনে। 'আজ তো বুধবার!'

'তাই কি? প্রশ্ন করে মিহির।'

'তোমার তো ফার্ষ্ট পিরিয়ডে ক্লাশ নেই। এতো সকালে বেরুলে যে? আমার ঘরে থাকাই দায় হ'লো ব'লে।'

মিহিরের কণ্ঠস্বর আজো সুরেলা, বলা শেষ হয়ে গেলেও রেশ বাজতে থাকে কানে।

'তবু বলে—পথের মাঝে কাব্য করবার বয়স নেই।'

'রবীন্দ্রনাথ খুব কচি বয়সকে লক্ষ্য করে লেখেননি কথাগুলো।'

'রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারেন।'

'লিখতে পারেন। জীবনকে অনুভব করবার মন্ত্র তাঁর জানা ছিল।'

'চুপ করো। আমি তোমার ছাত্রী নই।'

তবু থামতে জানে না মিহির।—হলে ভালো হতো।

'তাই বুঝি!'

এমনি এ কথা থেকে সে কথা। অর্থহীন বলা চলে পাকা বিষয়ী-বুদ্ধিতে। কথার পিঠে কথা দিয়ে ঝগড়া পাকিয়ে পথ থেকে সরে আসে গাছের ছায়ায়। অনেকদিন পর সুলতার নজরে পড়ে—কৃষ্ণচূড়া। বিশাল গাছের কালো কালো শাখা ভরে গেছে লাল ফুলে। উজ্জ্বল রোদে দুলছে স্তবকে স্তবকে অগ্নিশিখা।

হিসেব থাকে না সময়ের। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে বাজে এগারোটা। উঠে পড়ে দু'জনেই।

সুলতা হষ্টেলের ঘরে ঢুকে নিজেকে এলিয়ে দেয় ইজি-চেয়ারে। বেলা গোনে বারো। আজ আর স্কুল করা হবে না।

গত তিন বছরে একটি মিনিট এদিক ওদিক হয়নি কোন কাজে। ঘুম থেকে উঠে রাত সাড়ে ন'টা অবধি একেবারে কসে বাঁধা কাজের জোয়াল। 'নেই কাজ তো খৈ ভাজ'। এ শুধু বাংলা-প্রবাদের সত্য নয়। কাজ না থাকলে অ-কাজে অর্থাৎ দুশ্চিন্তায় মশগুল থাকবে না।

বান্ধবীরা আড়ালে মন্তব্য করে—অর্থ-পিশাচ।

তারা হিসেব করে ওর আর্থিক প্রয়োজনের, মানসিক প্রয়োজনের নয়।

সেই সুলতা আজকে 'রুটিন' ভেঙেছে। খবরটা যদি জানতো ইংরেজীর টিচার লীলা মজুমদার! সুলতাকে সে সইতে পারে না। মন্তব্য করেছে—ভেতরে ভেতরে অনেক জল গড়িয়েছে রে! নইলে এমন ঢেউহারা হয় নদী!

ইংরেজী কাব্যবোধ প্রখর ব'লে কিনা কে জানে লীলা মজুমদার ঢেউহারা নদীর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই উপমা দিয়ে মন্তব্য করেছে। এদিকে

হষ্টেলের ঝি কামিনী বিড় বিড় করে। ঘরে ঢুকেছে যে সুলতা আর বেরুনোর নাম নেই, সুলতার কাজ মিটলে সে যাবে বাড়ী! ঠাকুর তার উপর চাপিয়ে সরে পড়েছে। বিড় বিড় করে—'বিদ্যেধরীদের' কখন যে কি মেজাজ!

কামিনী হষ্টেলের সব 'টিচারকেই' বিদ্যেধরী বলে।

'দিদিমণির শরীল ক্যামন?'

সুলতার কুশল জানতে চেয়ে নিজের দুর্ভোগের কথা শুনিয়ে চলে যায় কামিনী।

সম্বিত ফেরে সুলতার।

মিহির এসে হিসেব পালটে দিয়েছে। আর নয়। চৈত্রের খরায় পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া মাটির বুকে ফসল ফলানোর মিথ্যে আশাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়।

তোয়ালে আর সাবান নিয়ে 'বাথরুমে' ঢোকে সুলতা।

তখন বিকেল। রোদ্দুর ঝাঁঝালো নেই। বাতাস বইছে এলোমেলো। জানালায় মুখ রেখে বসে ছিল সুলতা। দেখছিল দূরের কৃষ্ণচূড়ার কালো শাখা আর লাল ফুল।

এমন সময় কামিনী এসে জানালো—দিদিমণি আপনের 'ভিজটর' আইছে। 'ভিজটর' অর্থাৎ ভিজিটর।

কে আসতে পারে! ভেবে থই পায় না। গত তিন বছরে কেউ আসেনি! টুইশানের কথা পাকা করবার জন্যেও কোন ছাত্রীর তরুণ দাদা সাহস করেনি আসতে। ভাবতে ভাবতে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। হাওয়ায় এলোমেলো চুলগুলোকে গুছিয়ে নেয়।

ঘরে এসে হাজির হয় লীলা মজুমদার।

সুলতার 'ভিজিটর'! সংবাদটি বিস্মিত করেছে সবাইকে। উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে লীলা ফাটছে উৎসাহে।

শহরের শিক্ষিত মহলে যাকে নিয়ে হয়েছে অনেক আলোচনা সে হলো সুলতার 'ভিজিটর'। তার মানে ওরা আগে থেকে পরিচিত। নতুবা ইদানীং ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

তাই বলো ওর সমন্ধে আলোচনায় সুলতা গম্ভীর কেন!

'তোর ভিজিটর এসেছে।'

'শুনলাম। কামিনী জানিয়ে গেছে।'

সুলতার জবাব দেবার ধরণে অনেকখানি উৎসাহ মিইয়ে যায়। তবু বলে 'কে জানিস?'

'না ভেবেই পাচ্ছি না।'

'তা পাবে কি করে। এসেছেন স্বনামধন্য কবি-অধ্যাপক মিহির সান্ন্যাল।'

'মিহির!'

বিস্ময়ে ওর নাম উচ্চারণ ক'রেই নেমে যা'য় সুলতা। লীলা মজুমদার বেড়িয়ে যায়। ঝড় বয় মনে। যাবে, না যাবে না।

ফিরিয়ে দেবার অভদ্রতার দিক ভেবে নয়। ফিরিয়ে দিতে মন না চাওয়ায় এসে হাজির হয় সুলতা।

'এলে যা হোক। আমি তো সব ক'টা চেয়ার টেবিল গুনে ফেলেছি।'

'একটু দেরী হয়ে গেলো।'

কৈফিয়ৎ দেয় সুলতা।

তারপর মিহির না সুলতা কে কথা সুরু করবে—এই ভেবে বোধ হয় দুজনেই চুপ ক'রে থেকে। 'কিছু সময় পর মিহির বলে—'চলো কোথাও বেরুনো যাক।'

'না। উপায় নেই। অনেক কাজ।'

'ভালো কথা। তোমার অনেক কাজের ব্যাঘাত করবো না। যাই তবে।'

বলেই পা বাড়ায় মিহির। ওর মুখখানা আর দেখা হয় না।

'কিন্তু শোন……'

সুলতার কি যেন বলবার ছিল!

মিহির চিরকালই এমনি। বড় অভিমানী। আর আসবে না সে। জানা কথা। আজ থেকে দেখছে না তাকে। কিন্তু সে ক্ষতি কি পোষাবে সুলতার? সেবারেও এমনি ক'রেই ফিরে গিয়েছিল মিহির।

হঠাৎ আসা দমকা হাওয়ার মতোই তাদের মাঝখানে এসেছিল সোমনাথ। শক্ত-সামর্থ গড়নের ফর্সা ছেলেটি। শুধু বয়সেই নয় অভিজ্ঞতায়ও মিহিরের চেয়ে বড় ছিল। সুন্দর কথা কইবার, গান গাইবার গুণে অতি অল্প সময়েই সে বন্ধু হয়ে গিয়েছিল অনেকের। সুলতার হয়ে উঠলো ঘনিষ্ঠতম।

অলক্ষ্যে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল মিহির।

আর এদিকে ঝড়ের বেগে সুলতাকে অনেক দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেছে সোমনাথ। বন্ধু-সাথী অনেকেই সাবধান ক'রে দিয়েছে। শুধু আসেনি মিহির।

লাইব্রেরী আর ক্লাশ নোটের বাইরে যে পৃথিবী আছে এ কথা বোধহয় ও ভুলে গিয়েছিল। সুলতার ফিরবার পথ ছিল না। সোমনাথ নিয়েছে অনেক। পুরো একটা বছর না ঘুরতেই অন্য সকলের সংগে জানলো সুলতা সোমনাথ চলেছে বিলেত। উচ্চশিক্ষার জন্যে।

চৈত্রের সুরু সেখানেই। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সম্মান বাঁচলো। আগুনে পুড়ে খাক হয়ে এলো শকুন্তলা বিদ্যাবীথির শিক্ষিতা হয়ে। সে আরেক গল্প।

কিছুই অজানা নয় মিহিরের। তবু সে ফিরে গেছে!

কথাগুলো ভেবে বিছানায় এ পাশ ও পাশ ক'রে ঘন ঘন আঁচলে চোখ মুছে স্বস্তি মেলে না।

রাতটাও শেষ হয় না ছাই! বড় বেশী দীর্ঘ মনে হয় বারান্দায় পায়চারী করতে করতে।

তখনো সকাল হয়নি পুরোপুরি। সবে শুকতারা ডুবেছে। ভোরের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে মফঃস্বল শহরের বুকে। দরজার কড়া নাড়ার শব্দে উঠে পড়ে মিহির। সবিস্ময়ে বলে—'সুলতা!'

'এলাম।'

এর বেশী আর বুঝি কোন কথা ওরা জানে না।

এগিয়ে আসে মিহির—চৈত্রের আগুন জ্বালাকে হটিয়ে দিয়ে যেমন আসে কাল-বৈশাখীর ঝড়-বাদল। হাসি ছড়িয়ে পড়ে সুলতার জল-ভরা চোখে, শিহরণ লাগে তনুতে।

বাংলায় তানসেনের সংগীত ধারা প্রবর্তন ও সংরক্ষণ

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীকে কেন্দ্র ক'রে যে সঙ্গীত ধারা সমস্ত উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবর্তিত হয়, তার প্রভাব বাংলায় আসে প্রায় দুই শতাব্দী পরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্থায়ী অনুশীলন শুরু হয়। এই ধারার প্রধান প্রবর্তক ছিলেন তানসেন। সঙ্গীত স্রষ্টা তানসেনের সঙ্গীতে ছিল এক অভিনব রূপ, তাঁর সুরে, ছিল সঙ্গীতের মর্মকথা। তিনি যে ধারার প্রবর্তন করলেন তার প্রবাহ চললো শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই আদর্শই অনুপ্রাণিত করল পরবর্তী যুগের সঙ্গীত সাধকদের। সাধক তানসেন শুনেছিলেন যুগের আহ্বান। সেই সময় ভারত ও পারস্য এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান চলেছিল। এই আদান প্রদানের ফলে ভারতীয় সঙ্গীতও নানাভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এতাবৎ ভারতীয় সঙ্গীতের যা রূপ ছিল, তা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল কি না বলা কঠিন কিন্তু সুরে ও ভাবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুললিত ভাব আসে তানসেনের যুগ থেকেই। সেই জন্য তানসেনের ধারা সর্বাদীসম্মত। সঙ্গীত প্রগতিশীল, সঙ্গীত সকল যুগে নতুন স্রষ্টার উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান। তাই তানসেন, শুধু বিস্মৃতির অন্ধ গহ্বরে লুকোনো রত্নের সন্ধানেই মনোনিবেশ করলেন না, সঙ্গীত মহিমাময় ক'রে তুললেন তাঁর নবতম অবদানে। সাধারণত দেখা যায় বিলুপ্তি থেকে উদ্ধারের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের সংস্কারগত কিন্তু নতুন সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি সঙ্কুচিত। কিন্তু তানসেন জীবিত অবস্থায় দেখে গিয়েছিলেন যে তাঁর নব সৃষ্টি ও ধারা সমগ্র ভারতে স্বীকৃত। এটা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। তানসেনের যুগ ছিল সাম্রাজ্যবাদের যুগ। গুণগ্রাহী সম্রাট আকবর ছিলেন তাঁর ভক্ত। তানসেনের সঙ্গীত বিষয়ক গবেষণা ও নব উন্মেষের পক্ষে এই অবস্থা অনুকূল ছিল। তখনকার দিনে রাজা বাদশা'র প্রদত্ত সম্মানই সর্বাগ্রে গণ্য হতো। জনসাধারণের সমাদর ছিল গৌণ। কিন্তু তানসেন একাধারে রাজ সম্মান ও দেশের সম্মান অর্জন ক'রে

গেছেন। তাঁর সঙ্গীত-ধারা এত জনপ্রিয় হ'লো তার কারণ, তিনি সঙ্গীতের মাধুর্যকেই প্রাণ ব'লে স্বীকার ক'রে গেছেন এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও গানের মধ্যে অশাস্ত্রীয় সুর-দ্বন্দ্ব ও লয়-দ্বন্দ্বকে বর্জন করেছেন। সুর মাধুর্যই গানের প্রাণ। এ বিষয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় তাঁর গান ও সুর আলোচনা করলে। অষ্টাদশ শতাব্দী আগে বাংলায় যে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রচলন ছিল, সেটা ঠিক প্রণালীবদ্ধ ছিল না। সঙ্গীত শিক্ষার অদম্য উৎসাহ নিয়ে যে সব বাঙালী শিক্ষার্থীরা বাংলার বাইরে যেতেন, তাঁদের মধ্যে অতি অল্পই সুশিক্ষিত হয়ে ফিরে আসতেন। কারণ যাত্রাপথ ছিল সুদীর্ঘ ও দুরূহ এবং শিক্ষাপথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু যে যা কিছু নিয়ে এসেছে বাংলার মাটি বাংলার জলে তা হয়ে উঠেছে সার্থক। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর অনেক মিশে গেছে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত, কীর্তন ও অন্যান্য সঙ্গীতে। কাব্য-ভাবে শ্রেষ্ঠ বাংলার গান হ'য়ে উঠল গরীয়ান, যখন সুর-ভাবের অভাব থেকে সে মুক্ত হল। তানসেনের এক বংশধর বাহাদুর খাঁ (সেন) অষ্টাদশ শতাব্দীতে এলেন সুদূর বাংলায়, আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বিষ্ণুপুর মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের এবং বিষ্ণুপুরে বসতি ক'রে সকল স্বার্থ ত্যাগ ক'রে এক স্বার্থে মনোনিবেশ করলেন। এই এক স্বার্থ—বিদ্যাদান তাঁর চিত্তে চির আশ্রয় গ্রহণ করল। তিনি বাংলার শান্ত পরিবেশের মধ্যে সাধনায় নিমগ্ন হলেন। উপযুক্ত পাত্রে বিদ্যাদান তাঁর জীবনের ব্রত হল। বাংলায় তানসেন প্রচলিত ধারায় প্রবর্তনে বাহাদুর খাঁ ছিলেন সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠ।

বাংলায় দেশীয় সঙ্গীতের উপর এই সঙ্গীতের প্রভাব পড়ল। উনবিংশ শতাব্দীতে এর ব্যাপক প্রকার পরিলক্ষিত হয়। বাংলার ভাবপ্রবণতা, বাংলার কাব্য সম্পদ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীকে শ্রীমণ্ডিত করলো। সুরভাব ও কাব্যভাবের মিলনতীর্থ এই বাংলা। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের সুরে যে দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল, যে দেশের বাউল গান, মাঝিদের ভাটিয়ালি গান পল্লীর ঘরে ঘরে শুনিয়ে যেত আধ্যাত্মিকতা, মানবতা, সংসারের অনিত্যতা, সেই দেশে নিছক সুরের খেলায় সঙ্গীতের উন্মাদনা আনতে পারল না। সুরের হাট, ভরপুর কিন্তু ভাবের হাট দেউলিয়া—তাই বাংলার কবি, বাংলার সাধকশিল্পী সঙ্গীতের এই দৈন্য মুক্ত করলেন তাঁদের বাণী ও ভাব দিয়ে।

বাংলা দেশে তানসেন প্রবর্তিত ধ্রুপদ গানের যথেষ্ট প্রচলন শুধু নয় বহুবিধ উন্নতিও সাধিত হয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে ধ্রুপদ ও টপ্পা গানকে বাংলা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। তাই বাংলা গানের মধ্যে ধ্রুপদ ও টপ্পার প্রকাশ। তানসেনের ধ্রুপদের যথারীতি সংরক্ষণ বাংলায় যেরকম হয়েছে, সেরকম আর কোথাও হয় নি। দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং রামমোহন ব্রাহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে তানসেনের ধ্রুব পদ্ধতির গানকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখলেন। এ-ছাড়া বাংলার অনেক সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার তানসেনের সুর ও ছন্দ নিয়ে গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের হিন্দীভাঙা গানের মধ্যে তানসেন, হরিদাস স্বামী, আনন্দ কিশোর, নওলকিশোর এবং যদুভট্টের মূল গানই বেশী। তাঁর অসংখ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে সংরক্ষিত আছে, মধ্যযুগের আদর্শ সঙ্গীত ধারা।

রবীন্দ্রনাথের গান, বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমান এবং সেই গানের সুরে কত তানসেনের সুর আজও অক্ষয়, অমর হয়ে আছে।

মালতীদির গল্প

প্রতিভা বসু

কাল মালতীদিকে দেখলাম। লিনজে স্ট্রীটের মোড়ে। মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই। দু'খানা ধুলিধূসরিত নগ্ন পায়ে আপন মনে হেঁটে চলেছেন। কতদিনের না-আঁচড়ানো রুক্ষ চুল জটবহুল। তেলহীন, জলহীন। তার উপর খানিক খানিক উঠে গিয়ে মাথার পিছলে অংশ দেখা যাচ্ছে। ঘাড়ের কাছে যে-চুল আগে ঘনতায় থোকা হ'য়ে মেঘের মতো কাল রং নিয়ে লুটিয়ে থাকতো সে-চুল এখন দু'গাছি শনের মতো বাতাসে উড়ছে। সারা গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন ফুটোফাটা ধূসর রংয়ের জুটকম্বল জড়ানো।

আমার সঙ্গে আমার বড়দির ছেলে সুবীর ছিলো, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সে-ই আমাকে দেখালো। 'মাসী, তোমার মালতীদি।' আমি চকিত হ'য়ে তাকিয়ে বললাম 'মালতীদি? কই রে?'

'ঐ ত্যাখো। কী রকম।'

'তাই তো।'

মালতীদি হাসছিলেন মুখ টিপে টিপে, কী যেন বিড়বিড় করছিলেন ঠোঁট নেড়ে নেড়ে।

স্তব্ধ হলাম।

বিকেলের ধূসর আলো রঙিন ছায়া ফেলেছে রাস্তার উপর। উল্টো দিকে গড়ের মাঠের দিগন্তে অস্তমান সূর্যের রক্ত আভায় সারা চৌরঙ্গী উদ্ভাসিত; মালতীদির-ফাঁকা-হ'য়ে যাওয়া চুলে, মুখে, মাথায়ও তার স্পর্শ। যখন কাছে এলেন ভয় পেয়েছিলাম। চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেরই অজান্তে চট ক'রে কখন জানি ফুটপাতে উঠে স'রে দাঁড়িয়েছিলাম।

মালতীদি দ্রুত পায়ে কাছে এসে থামলেন, হেসে বললেন, 'ঠিক চিনতে পেরেছি। তুমি আমাদের মণি না?'

মুখের উপর তাড়াতাড়ি একটু আল্‌গা হাসি ভাসিয়ে দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। আপনি—মানে আপনি তো—'

'আমি শ্রীমতী মালতী দেবী চৌধুরানী।' তৎক্ষণাৎ বুক টান ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন মালতীদি, সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে। মুখের ভাবটা রীতিমতো কঠিন ক'রে বললেন, 'মিসেস নরনারায়ণ চৌধুরী, রানী অব গোপালনগর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে রইলাম।

সুবীর বললো, 'চলো।'

মালতীদি বললেন, 'একটা টাকা দিতে পারো?'

আমি তক্ষুনি ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিলাম।

মালতীদি ভাঙা দাঁতে বীভৎসভাবে হাসলেন, তাঁর ছোটো ছোটো করমচার মতো চোখে সহসা দুই বিন্দু জল টলমল ক'রে উঠলো, মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। আবার তখুনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মাসোহারাটা কিনা এখনো আসেনি, তাই ভারি অসুবিধেয় প'ড়ে গেছি। আমাদের হ'লো গিয়ে বারো লক্ষ টাকার এস্টেট। সে কি একটা যে সে কথা? আর তার প্রধান বৌরানী হ'লাম আমি। বুঝতেই তো পারো সেই মাসোহারা! সে যে কত!'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'তাই তো।'

সুবীর গোপনে আমার হাত টিপলো, 'মাসি, চলো।'

নিঃশব্দে পা বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু মালতীদি ছাড়লেন না। পিছে পিছে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমাকে ওরা আটকে রেখেছে কিনা। তাই তো যতো মুস্কিল।'

আমি বললাম, 'কারা?'

'কেন?' এমন একটা কথা জানি না দেখে মালতীদি অবাক। 'আমার দাদারা? ওরা বলে কী জানো? স্বামীকে ছাড়ো, নইলে মেরে ফেলবো। এই ছাখো না ধাক্কা দিয়ে ফেলে কেমন দাঁত ভেঙে দিয়েছে।'

'সত্যি?'

'তা নয় তো কি বাজে কথা বলছি?'

'না, না; তা বলেননি—'

'আমার যে পিসতুতো বড়ো দাদা সেই চিদানন্দ দত্ত কাব্যনিধি, জানো তো

আজ না,' নাম শুনেছ তো? অত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আর দিগ্‌গজ পণ্ডিত। পাড়ে কী, "ও আবার একটা স্বামী, ও একটা শুয়োর।" লজ্জায় দুঃখে মালতীদি যেন অভিভূত হলেন। আর আমি ভয়ে অভিভূত হ'য়ে বললাম, 'চিদানন্দ দত্ত মারা গেছেন না?'

'আহা মারা তো গেছেন, তাতে কী হয়েছে? ওর দেহটাই নষ্ট হয়েছে—আত্মাটা তো আর যায়নি? আত্মার তো বিনাশ নেই! কেবল পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করা। ঠিক যেন গাছের বাকল। কিন্তু জানিস ও লোকটা কেন এখনো কোনো নতুন দেহে ঢুকতে পারছে না?'

আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'না।'

'আমাকে যন্ত্রণা দেবার জন্য। শুধু আমাকে জ্বালাবার জন্যই ও এখনো জন্মাতে পারছে না। তা নৈলে পরিবারে তো এরি মধ্যে কম বাচ্চা হ'লো না? এলে আসতে পারতো না?'

সুবীর আস্তে আমার কাঁধের উপর হাত ছোঁয়ালো, 'মাসি, চলো।'

যাবো কী, মালতীদি যে ছাড়েন না। বললেন, 'মহাভারতের সেই গল্পটা জানিস তো? ঐ লোকটা যা দেখছি শেষে তির্যক যোনিতেই জন্মাবে। সেদিন আমি আমাদের পুরোনো বালিগঞ্জের বাড়িটাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বাতাস ছুটিয়ে আমাকে উল্টে ফেলে দিল। আমার যে স্বামীর সঙ্গে একটা মিল হয় সেটা ও মোটে চায় না।'

আমি একটু হাসলাম, ঢোঁক গিলে বললাম, 'ভারি ইয়ে তো। কিন্তু আমি এখন যাই।'

'ও, যাবি? কিন্তু বড়ো দরকারি কথা ছিলো যে একটা—'

'সে না হয় আর-একদিন হবে।'

'আরেকদিন!' খুব চিন্তা করতে লাগলেন মালতীদি, দুই চোখ ছোট ক'রে বাঁ হাতের নখের সঙ্গে ডান হাতের নখ ঘষতে ঘষতে আনমনা হ'য়ে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, 'আরেকদিন!' 'আরেকদিন!' তারপর হঠাৎ দুই চোখ তার চকচকে হ'য়ে উঠলো, সামনে তাকিয়ে কী যেন দেখতে পেলেন তিনি, আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে ছুটে গেলেন সেখানে। আমি তাকিয়ে দেখলাম দু'জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে আইসক্রীম চুষতে চুষতে কাঠি দুটো ফেলে দিল রাস্তায়।

২

এই মালতীদিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ঢাকায়, আমার বন্ধু মঞ্জুর বাড়িতে, তার আত্মীয় হিসেবে। রমনার একখানা ছোট্ট দোতলা বাড়ির ছাদ, যে ছাদের অর্ধেক জুড়ে একটি মস্ত লিচু গাছ আর আম গাছ এক সঙ্গে বুনট হ'য়ে মস্ত ছায়া বিছিয়ে রেখেছে নকশি-কাটা শীতল পাটির মতো, সেই ছায়ার তলে স্নান ক'রে চুল মেলে দিয়ে তন্বী গৌরাঙ্গী এই মালতী রায় ব'সে-ব'সে একখানা কবিতার বই পড়ছিলেন। মঞ্জুশ্রী আলাপ করাতে নিয়ে এলো। তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন, চোখে মুখে সারা চেহারায় সাগরপারের লালচে আভা তার সমস্ত উজ্জ্বলতা নিয়ে ছড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বইয়ের ভাঁজে আঙুল রেখে হাসলেন 'এসো। মঞ্জুর কাছে এত শুনেছি যে নির্ভুলভাবেই ব'লে দিতে পারি তুমি মণিমালা, এই শহরের বিখ্যাত গাইয়ে। বলো ঠিক কিনা।'

ছোটো আর ভাসা চোখে হাসির আলো উপচে পড়লো। ভয়ানক ভালো লাগলো। আমি মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম।

বয়সের ব্যবধান আমাদের কম নয়। আমি আঠেরো, মালতীদি আটাশ। দশ বছরের ছোটো বড়ো। কিন্তু মুহূর্তেই সেই ব্যবধান ডিঙিয়ে বন্ধু হ'য়ে উঠলাম। মালতীদি বললেন, 'বোসো।'

ব্যস্ত হ'য়ে মঞ্জুও বললো, 'বসবে কী! বাঃ। যাবো না?'

'কোথায়?'

'বিধবা আশ্রমে একজিবিশন হচ্ছে না?'

'ও,' নরম ক'রে হাসলেন মালতীদি। 'সে বিকেলে যাওয়া যাবে'খন। কী বলো?' তিনি আমার দিকে তাকালেন।

'বিকেলে! আশ্চর্য! বিকেলে তোমার চায়ের নেমন্তন্ন না?' মঞ্জু ভুরু কুঁচকোলো, 'তাছাড়া অত দূর থেকে মণিই আবার আসতে পারবে নাকি?'

'কতদূর?'

'সে অনেক। তুমি বুঝবে না। ঢাকা শহরের মানচিত্র তোমার দখলে নেই। চলো, চলো।'

আমি উঠছিলাম, কিন্তু মালতীদি আঁচল টেনে বসিয়ে দিলেন, 'একজিবিশন

আজ না হয় কালই দেখা যাবে, কিন্তু এমন সুন্দর সকাল তুমি আর কোনোদিন পাবে না। আকাশ দেখেছো? কী নীল। বাতাস কী সুন্দর ঠাণ্ডা।'

মঞ্জু রাগ ক'রে বললো, 'যা খুশি তাই করো, আমি কিছু জানিনে।'

'আর কিছু না জানো,' মালতীদি হাসলেন, 'চা করতে তো জানো খুব ভালো। লক্ষ্মীটি, দয়া ক'রে তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

এক কাপ নয়, এক পট। স্টোভ জ্বালিয়ে তৈরি করলো মঞ্জু। সঙ্গে ঢাকাই বাখরখানি আর কালাচাঁদের প্রাণহরা সন্দেশ। গল্প করতে-করতে ছাদের সেই টিপাটিটুকু স্মরণীয় হ'য়ে রইলো।

তারপর সেই বন্ধুতাই নিবিড় হ'য়ে উঠেছিলো দিনে দিনে। আর সেই সব দিনের ভালোলাগারও কোনো তুলনা ছিলো না। সবাই ঠাট্টা করেছে। গুরুজনের কাছে বকুনি খেয়েছি এই অদ্ভুত সাম্যহীন বন্ধুতার জন্য—কিন্তু তাতে কী?

বিলেতে মালতীদি পি. এইচ. ডি. হ'তে গিয়েছিলেন। ছাত্রজীবনের কাহিনী তাঁর অতি উজ্জ্বল। কুমিল্লা কি নোয়াখালির কোনো এক গ্রামের নেহাৎ সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তিনি। তাঁদের বাড়ির পুরুষেরাই কখনো বিশ্ববিদ্যালয় চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ, সেই বাড়ি থেকে এই। প্রথমে বাপ বৃত্তি-স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছিলেন শখ ক'রে, যেমন শিশু বড়ো হ'তে থাকলেই পাঁচজন বাপ মা দিয়ে থাকেন। কিন্তু মালতীদি আর পাঁচজনকে ছাড়িয়ে সব পরীক্ষায় পুরো নম্বর রেখে বৃত্তি পেলেন সেখান থেকে। ইশকুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মা বাপ সবাই খুশি হয়েছিলেন সেই সাফল্যে, কিন্তু সেই খুশি এতটা নয় যাতে মালতীর বাবা আবার তাকে হাই স্কুলে ভর্তি ক'রে দিতে পারেন। কিন্তু বৃত্তিটাই সেই সুবিধে ডেকে আনলো। টাকা পাচ্ছে, তখন সবাই বললো পড়ুক। অতএব—

সেখানে গিয়েও কিন্তু মেয়ে দ্বিতীয় হ'লো না কোনোদিন। ফলত আরেকটা বৃত্তিও জুটে গেল ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে। এবার অবহিত হলেন বাবা। মনে-মনে মেয়েকে সমীহ করলেন তিনি। কলেজে ভর্তি

করতে একপলক চিন্তা করলেন না। আই. এ.র পর বি. এ., বি. এ.র পর এম. এ. পড়তে কলকাতা এসে বাসা বাঁধলেন মালতীদি, এবং শেষ পর্যন্ত ঘটিবাটি বন্ধক দিয়ে বাপ তাঁকে বিলেত পর্যন্ত পাঠালেন। এর পেছনে অনেক আশা ছিলো বৈ কি। আশার চেয়ে ভরসা ছিলো বেশি।

যে-মেয়ে এত নিষ্ঠার সঙ্গে তরতরিয়ে পরীক্ষার শক্ত সোজা সব ক'টা সিঁড়ি এমন ক'রে ডিঙিয়ে এতদূরে এসে পৌঁছলো, তাকে আর অল্প একটুর জন্য অসম্পূর্ণ রাখার দরকার কী?

কিন্তু বিদেশে গিয়ে মালতীদি তাঁর বাপের ঘটিবাটি-বন্ধক-দেয়া টাকায় যে শুধু বিদ্যাই অর্জন ক'রে এলেন তা নয়, দু'হাতে দু'গাছা সরু শাঁখাও প'রে এলেন।

'বিলেতে শাঁখা? অবাক কাণ্ড।' আমি মুখের দিকে তাকালাম।

মালতীদি হাসলেন, 'আর বলো কেন? ওর পাগলামির অন্ত দেখিনি।'

'কার?' আমার চোখ জিজ্ঞাসায় বড়ো হ'লো।

'সে আমার এক বন্ধুর।' মালতীদি হাত বাড়িয়ে লিচু গাছের পাতা ছিঁড়লেন, 'কী না করলো এই এক জোড়া শাঁখার জন্য। পাগল। পাগল। এর দাম কতো জানো?'

আমার অল্পবয়সী মন কৌতূহলে ভ'রে উঠলো। শাঁখার দাম শুনতে আমার ঔৎসুক্য নেই, জিজ্ঞেস করলাম, 'কে সেই বন্ধু?'

'কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি?' মালতীদির মুখের হাসিটি তেমনি অমলিন।

বললাম, 'হচ্ছেই তো।'

মালতীদি বললেন, 'ভয় নেই। তার সাধ্য নেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। সে মেয়ে নয়।'

এবার আমি হাসলাম, 'আহা, মেয়ে না হ'লে বুঝি আর মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে না? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আসলে তিনিই, যিনি আপনার জন্যে কতো কাণ্ড ক'রে কতো দাম দিয়ে এই শাঁখাজোড়া সংগ্রহ করেছিলেন, ভালোবেসে হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।'

'ভালোবেসে!' মালতীদি হাসতে গিয়েও কেমন আনমনা হ'য়ে গেলেন।

তাঁর মন আর চোখ দুই-ই আকাশে নিবদ্ধ হ'লো। মন খারাপ হ'লে এই তাঁর বিশেষ ভঙ্গি।

৩

সেদিন ঐ পর্যন্তই। পরে টুকরো-টুকরো ভাবে যা শুনেছিলুম তা এই: মালতীদি এঁর সঙ্গেই বিলেত যাবার সময়ে এক জাহাজে ভেসেছিলেন। সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় এই মানুষ। গুণে, যোগ্যতায়, বন্ধুতায় অতুল্য। অন্তত মালতীদির তা-ই মনে হয়েছিলো।

আসলে মালতীদি পড়াশুনো নিয়ে ছাত্রকালটা এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এই মুগ্ধ হবার দৃষ্টিটা এতকাল অন্ধ ছিলো তাঁর। তা নৈলে এই মানুষটির সঙ্গে এই জাহাজের সহযাত্রী হ'য়েই যে প্রথম আলাপ হ'লো তা নয়। আরো অনেকবার, অনেক জায়গাতেই দেখেছেন। কলকাতার রীতিমতো একজন বিশিষ্ট নাগরিক ইনি। এঁর রূপ এবং বিত্ত দুয়েরই খ্যাতি তখন বাংলা-দেশের অনেক জায়গায় ছড়ানো। পাঠ্য পুস্তকের তলায় চাপাপড়া মন নিয়ে মালতীদি তখন লক্ষ্য করতে পারেননি। কিন্তু জাহাজে সে-ভার ছিলো না, মন ফাঁকা ছিলো, ফার্স্ট হবার জন্য গোগ্রাসে পেপার তৈরি করবার দায়িত্ব না থাকায় অবকাশ ছিলো প্রচুর, মোটা-মোটা বই হাতে নিয়ে চোখ অন্য দিকে পাঠিয়ে নানা কথা ভাববার কিংবা না ভাববার স্বাধীনতা ছিলো, অতএব মালতীদি এতদিনে মন আর চোখ একত্র ক'রে তাকাতে পারলেন এই অনন্ত পৃথিবীর দিকে। বুঝতে পারলেন এখানে ফুল ফোটে, বাতাস ছোটে, চাঁদের আলোয় মোহময় হ'য়ে ওঠে রাতগুলো, অন্ধকারে তারার চুমকি আকাশকে সাজায়, দিনের প্রখর রোদে হৃদয় ধূ ধূ করে, মেঘলা দিনে মন মানে না।

রমেন সেন যাচ্ছে ব্যারিস্টারি পড়তে, আর মালতীদি পি. এইচ. ডি.। এতকাল পরে হঠাৎ রমেনের ব্যারিস্টারি পড়ার শখ হ'লো কেন সেটা অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করা যেতো, কেননা বি. এ. পাশ করার পরে তার যতগুলো বছর কেটে গেছে মাঝখানে তার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আর লণ্ডন শহরও তার অপরিচিত নয়। এই নিয়ে তৃতীয়বার। মালতীদি শাদাশিদে মানুষ, অত প্রশ্ন মনে এলো না তাঁর। আলাপ ক'রে খুশি হলেন, যত্নে কৃতজ্ঞ হলেন, সঙ্গটা বইয়ের চেয়েও উপভোগ্য মনে হ'লো। তাঁর হৃদয়ের বন্ধ দরজায় আস্তে-আস্তে করাঘাত করলেন ইনি।

জাহাজেই শুধু নয়। লণ্ডন শহরে নেমেও রমেন 'গুড বাই' ব'লে বিদায় নিলো না পথের অন্যান্য সঙ্গীর মতো। মালতীদিকে ট্যাক্সি ক'রে পৌঁছিয়ে দিলো তাঁর নির্দিষ্ট বাসস্থানে, সব রকমে সহায়তা করতে লাগলো যখন যা প্রয়োজন, শহরের অলিগলি চিনিয়ে দিলো তিন দিনে, আদপে কায়দায় ব্যবহারে সাত-দিনে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হবার মতো যোগ্য ক'রে তুললো। বেড়ালো পার্কে, খেলো রেস্তোরাঁয়, রাত্রিটুকু বিচ্ছিন্ন হবার আগে তাকালো চোখে-চোখে—তারপর একদিন মালতীদি সচেতন হ'য়ে উপলব্ধি করলেন রমেনকে তিনি ভালোবেসেছেন।

ছোটোখাটো নিতান্ত অসহায় গোছের মানুষ মালতীদি। বয়েস তাঁর চব্বিশ হ'লে হবে কী, চোদ্দ বছরের মেয়ের মতো সরল, সহজ, নিষ্পাপ মন। গায়ের রং হলদে, চিনেদের মতো, মুখ চোখ চোখা নয় কিন্তু লাবণ্যে ঢলোঢলো, করমচা ছাঁদের ছোটো-ছোটো দুটি ভাসা চোখ ভাবে ভাষায় সমৃদ্ধ। হাতের গড়ন গোল, পায়ের পাতা পদ্মের মতো কোমল আর সুন্দর। কালো রেশমের মতো নরম চুল পিঠ ছাওয়া নয়, কাঁধের উপর ঘন থোকায় আঙ রগুচ্ছের মতো অবলুণ্ঠিত।

রমেন মৃদু হেসে বললো, 'এতদিনে তবে দয়া হ'লো তোমার?'

মালতীদি চুপ ক'রে রইলেন।

'তা হ'লে আমার স্বপ্ন সার্থক হ'লো, মালতী?'

'কী হবে?' হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে ব'লে উঠলেন মালতীদি।

রমেন তার নাক টিপে দিল, 'বয়স তোমার কত, খুকি?'

তারপর চললো বাড়ি খোঁজার পালা। মালতীদির ইচ্ছে ছিলো না, শুধু যে ছিলো না তা নয়, তিনি জেদও করেছিলেন এক বাড়িতে না থাকার জন্য। করমচা চোখে বাঁকা তাকিয়ে প্রথম দিন অবাক হ'য়ে বলেছিলেন, 'বাড়ি? বাড় কেন?'

'বাড়ি নয়, ঘর। পাখিদের স্থাখো না সময় হ'লে কেমন ঘর বাঁধে?'

'না।'

'কী না?'

'এই বেশ আছি।'

'বেশ আছো?'

'না, না, ও-সবে দরকার নেই।'

'কী নিষ্ঠুর তুমি।' এর পরে গাঢ় গলায় বলেছিলো রমেন।

চুপ ক'রে থেকে মালতীদি লাল হ'য়ে বলেছিলেন, 'তুমি তো জানো একসঙ্গে থাকতে হ'লে তার একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে।'

'বিলেতে এসেও সমাজ পাতাবে?'

'চিরদিনই কি বিলেতে থাকবে? দেশে যাবো না?'

'বম্বেতে নেমেই একপাতা সিঁদুর কিনে দেব, সারা কপালে, "সতী নারীর পতিই একমাত্র গতি" চিহ্ন লেপে বাড়ি গিয়ে উঠো।'

'বম্বেতে কেন, সেটা তো এখানে একবাড়িতে থাকার আগেই হ'তে পারে।'

'কেন, আইনের ফাঁদে না জড়ালে পালিয়ে যাবো ব'লে ভয় করছে তোমার?'

'তা কেন?'

'তবে?'

'তবে আবার কী? একসঙ্গে থাকবো অথচ এদিকে—'

একথা শুনে রাগ করলো রমেন। আর কিছু না ব'লে হনহন ক'রে চ'লে গেল ভারি মুখে। আর মালতীদি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটলেন পেছনে।

রমেন রাগ করলে কি তিনি থাকতে পারেন?

'ভালোবাসি। ভালোবাসি! ভালোবাসি।'

একদিন কথা বন্ধ রেখে, মিলন হবার পরে অস্থির আবেগে বলেছিলো রমেন, 'এই আমার একমাত্র মন্ত্র, এ ছাড়া আর কিছু নয়। তার জোরেই যদি তুমি আমাকে বেঁধে না-রাখতে পারো তবে কি রাখবে সাক্ষী সাবুদের জোরে?

তা তো ঠিকই। যুক্তিতে কে পারবে রমেনের কাছে। তবু কেন যে মালতীদির মন কিন্তু-কিন্তু করে কে জানে। চুপচাপ জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরের লতাটার দিকে, জবাব দিতে পারেন না।

রমেন আবার ভার হ'য়ে ওঠে, থমথম করে, বলে 'আসল কথা আমার প্রেমে তোমার আস্থা নেই, তুমি আমাকে চাও না। চাও কতগুলো অনুষ্ঠানের আবর্জনা।'

'না—না—তা নয়, তবে—'

'তবে আর কিছু নয় মালতী। এ-প্রহসন থাক। আমাকে বিদায় দাও।'

বিদায় দেবে? রমেনকে? মালতী? পায়রার মতো কেঁপে উঠলো বুক। তার চেয়ে দেহ থেকে তার প্রাণ চ'লে যাক না। পৃথিবী থেকে আলো মুছে যাক না। বিশ্বসংসারে মালতীর এমন আর কী আছে যার জন্য সে রমেনকে ছাড়তে পারে? তাছাড়া তার সংস্কারশূন্য শিক্ষিত মনও সায় দিল রমেনের যুক্তিতে। সত্যিই তো, দু'জন যে দুজনকে ভালোবাসছি এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো সম্পদ, সেখানে প্রহরী বসিয়ে লাভ কী? ভালোবাসা যদি কোনোদিন ফুরিয়েই যায় হৃদয় থেকে সামাজিক বন্ধনে কি তা আবার জোড়া লাগিয়ে দিতে পারবে? না তারা নিজেরাই সে জোড়াতালি-দেয়া জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে সংসারে?

সারারাত ভেবে-ভেবে আরো কথা মনে হ'লো মালতীদির। বিয়ে করবো দু'জনে, মিলন হবে দু'জনের, মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, বুকের মধ্যে আত্মা আছে, মনের মধ্যে আছে বিবেক। এই তো সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো সাক্ষী। অতএব—

অতএব কোনো এক মধ্যবিত্ত পাড়ায় ছোটো একটি ঘরে এসে উঠ্‌লো তারা। খোলা জানালায় বাগান ঝুলোলো, ভেতরে দুই দেয়ালে দুই খাট পেতে বিছানা করলো, কোণের দিকে পর্দা টাঙিয়ে সংসারের খুঁটিনাটি—জ্যাম জেলি রুটি মাখন, আপেল আঙুর। খড়কুটোর মিষ্টি সংসার। পাখির নীড়। মাঝখানে কার্পেটের উপর গোল টেবিলে বইপত্রের স্তূপ। দু'জনেই ছাত্র, দু'জনেরই তো পড়াশুনো আছে।

উদ্দাম বসন্ত নামলো, রঙে রঙে ছেয়ে গেল লণ্ডন সহরের আকাশ বাতাস, ধূলিকণাও সোনা হ'য়ে বিছিয়ে রইলো পায়ের তলায়। কয়েকটা দিন একেবারে উড়াল দিয়ে কাটলো।

স্টোভে ক'রে হাত পুড়িয়ে দু'জনে মিলে রান্না, আধাসেদ্ধ ভাত চিবিয়ে স্বর্গসুখের অনুভূতি, একসঙ্গে থাকতে পারার পরিপূর্ণতা—সমস্তটা মিলিয়ে ভরপুর হ'য়ে রইলো হৃদয়। বান-ডাকা সুখের জোয়ার।

কোনো এক রাত্রিতে রমেন বললো, 'খাট দুটো জুড়ে নাও না।'

চোখের জড়ানো ঘুম চকিত হ'লো মালতীর, চট ক'রে এপাশে ফিরে বললো, 'কেন?'

'স্বামী-স্ত্রী কখনো আলাদা ঘুমোয়?'

'স্বামী-স্ত্রী!'

'সন্দেহ আছে নাকি?'

'সন্দেহ?'

নতুন একটা দিক মুহূর্তে উন্মোচিত হ'য়ে উঠলো মালতীর কাছে। এ কথা তো সে ভাবেনি। স্বামী-স্ত্রী? রমেন স্বামী? সে স্ত্রী? তাই তো। তারা তো স্বামী-স্ত্রীই! স্বামী স্ত্রীরাই তো শুধু এভাবে থাকে। মালতী নিজেও তো এ সম্বন্ধটাই পাতাতে উৎসুক হয়েছিলো একসঙ্গে থাকার আগে। তবু যেন কী ভাবতে থাকে সে অন্ধকারে তাকিয়ে, কোথায় যেন খটকা লাগে তার মেয়ে-মনের চিরন্তন সংস্কারে। বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়া এতদূর এগিয়েও এই চৌকাঠটুকু সে ডিঙোতে পারে না। কে যেন তাকে সব কিছুর শেষে এই রাত্তিরে বিছানার চারপাশে গণ্ডি এঁকে রেখে দেয়।

রমেন বললো, 'জবাব দিলে না?'

ভয়ে-ভয়ে মালতী বলে, 'কিসের জবাব?'

'যা বললুম।'

'কী বাজে।' ভুরু কুঁচকে আবার পাশ ফিরে চোখ বোজে মালতী।

'বাজে বুঝি?'

মালতী চুপ।

কিন্তু দিন দুই পরে তার নিজেরই মনে দুর্বলতা আসে। বুজে থাকতে থাকতে ব্যথা হ'য়ে যায় চোখ, ঘুম আসে না। একবার পাশ ফেরে, একবার জল খায়, একবার তাকায় রমেনের খাটের দিকে তারপর আস্তে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকে, 'রমেন।'

'উঁ।'

'ঘুমুলে?'

'না।'

'কেন?'

'ভাবছি।'

'কী ভাবছো?'

'এ-বাড়ি ছাড়বো।'

'কেন, এর চেয়ে ভালো বাড়ির খোঁজ পেয়েছ নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'তোমার সঙ্গে থাকবো না।'

'কী?' ধ্বক ক'রে ওঠে মালতীর বুকটা।

'অন্তত রাত্তিরে এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'কেন?'

'তুমি দেবী হ'তে পারো, কিন্তু আমি মানুষ।'

এক মুহূর্তের অখণ্ড নিস্তব্ধতা। মালতীর যেন নিশ্বাস নিতেও ভয় হয়, মুখে-মুখে উচ্চারণ করে, 'আমিও তো মানুষ।'

'কিন্তু আমার রক্ত আছে, মাংস আছে, বৃত্তি প্রবৃত্তি সব আছে, আমার দেহ তোমার মতো পাথরের তৈরি নয়।'

'কোনো মানুষই কি পাথর দিয়ে তৈরি?'

'আর কেউ কিনা জানি না', রমেন নিশ্বাস ফেললো, 'তোমাকে তো তা-ই মনে হয়।' আবার কয়েকটি দণ্ডপল ডুব দিল সমুদ্রের গভীর তলায়। পৃথিবীর নাড়ি যেন থেমে রইলো কয়েক পলকের জন্য। তারপর মালতী রুদ্ধশ্বাসে ফিশফিশ করলো, 'আমি যা-ই হই না কেন, তুমি তোমার মতো ব্যবহার করলেই পারো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে রমেন বললো, 'মানুষের মধ্যে যে জন্তুও বাস করে তা কি তুমি জানো?'

'জানি।'

'তবে?'

'মানুষের মধ্যে জন্তু থাকে ব'লে মানুষ তো আর জন্তু নয়।'

'মানে?'

'মানে,'—ইতস্তত করলো মালতী, 'জন্তুর যেমন বিশেষ স্ত্রীপুরুষের মিলনই একমাত্র মিলন নয়, শরীর ছাড়া যেমন মন নেই, বিশেষ মানুষকে বিশেষভাবে গ্রহণ করবার বিশেষ অনুষ্ঠান নেই—'

আবার সেই সংস্কার। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলো রমেন, 'বুঝেছি। দোহাই তোমার, এই রাত ক'রে পাদ্রিসাহেবের মতো সার্মন দিও না। আমি ঠিক কাল চ'লে যাবো, দয়া ক'রে এই রাতটুকু ঘুমুতে দাও।'

'এতক্ষণ যখন ঘুমোওনি, তখন আর একটু জেগে আর-একটা কথা শোনো।'

'এখানে এসে বলো।'

'কেন, এখান থেকে বললে কি শুনতে পাবে না?'

'না।'

'তাহ'লে থাক।' মালতী পাশ ফেরে।

হঠাৎ ঝটপটিয়ে উঠে বসে রমেন, মুহূর্তে মালতীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়, দস্যুর মতো নিচু হ'য়ে দুই বলিষ্ঠ হাতে পাঁজাকোল ক'রে তাকে নিজের বিছানায় নিয়ে আসতে আসতে বলে, 'ঈশ! এইটুকু তো একটা চড়ুই, তার বিক্রম কত ছাখো না।' চুমু খেয়ে বলে, 'ভেবে দেখেছি ভাগ্যের কাছে হাত পেতে ব'সে থাকাটা নেহাৎ কাপুরুষের লক্ষণ, পুরুষকারই হচ্ছে আসল ধর্ম।'

মালতী একেবারে স্থির।

৪

রমেন বলেছিলো তার জীবনে এই মালতীদিই প্রথম মেয়ে যাকে তার জোর করতে হ'লো, যার জন্যে সাধনা করতে হ'লো, অপেক্ষা করতে হ'লো, বোকার মতো জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে নষ্ট করতে হ'লো অনেকগুলো সময়। রমেন এ-ও বলেছিলো, এই একমুঠো মানুষটার কাছেই জীবনে মাত্র একবার ঈষৎ পরাজিত বোধ করেছিলো সে। তার অভ্যাসবিরুদ্ধভাবে নৈতিক শুদ্ধতার এই যে গতানুগতিক কতকগুলো ইডিয়টিক ব্যবহার সে করেছে কয়েকটা মাস, প্রকৃতপক্ষে সেইটাই তার চরম অধঃপতন। তা নৈলে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে একবারের বেশি চোখে চোখ ফেলতে হয়নি তার, একবারের বেশি ঘাড় ফেরাতে হয়নি, একবারের বেশি—' একবারের বেশি আরো যে কী কী করতে হয়নি তার তালিকা জানে মালতী। মালতী দেখেছে রমেনকে নিয়ে মেয়েদের

কাড়াকাড়ি, মারামারি, মান অভিমান, হাংলামি। দেখেছে সভ্যতা সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে পেছনে ছোটা। কলকাতাতেও দেখেছে, বিলেতেও দেখেছে। ওর দেবদুর্লভ চেহারাই ওর কাল, ওর বাপের কুবেরের ধনও হয়তো বা এর সঙ্গে যুক্ত। রমেন যে কী অসম্ভব সুন্দর মালতীদি তা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে পারেন না। কী যে আশ্চর্য তার কাজল-ডোবানো লম্বা চোখ, চোখের পল্লব, ভুরু, বাঁশির মতো নাক, বাদাম ছাঁদের মুখ, বাঁকা-ধনু ঠোঁট, নীলচে শিরা, দুধ-গোলাপ রং, সুঠাম শরীরের ঋজু ভঙ্গি—পুরাকালের অর্জুনই বোধহয় একালের রমেন হ'য়ে জন্মেছে। আর উলূপী, দ্রৌপদী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রারাও সঙ্গে-সঙ্গে জন্মান্তর নিয়ে রানী, বাণী, শ্যামলী, সুধীরা হ'য়ে তৎক্ষণাৎ পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিচ্ছে সেই আগুনে। নইলে এত প্রেম সে পেলো কী ক'রে? আর শেষ পর্যন্ত মালতীদি।

না, তা নিয়ে কোনো আপশোষ নেই মালতীদির। কোনো অনুতাপ নেই। নিজেকে দিতে পেরেই তিনি সুখী হয়েছিলেন, নিঃশেষে দেবার আনন্দেই কানায়-কানায় ভ'রে উঠেছিলেন। কী পেয়েছেন কী পাননি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয়নি তাঁর। সেই প্রথম রাত্রের আত্মনিবেদনই তাঁকে শরীরে মনে পদ্মের মতো বিকশিত ক'রে তুলেছিলো, মোমের মতো গ'লে গিয়ে ধন্য হয়েছিলেন তিনি। আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যে সুখের কল্পনাও করতে পারেন নি, তারই নিবিড় উপলব্ধিতে সেই রাতে তার সমস্ত সত্তা স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো। রমেনের কল্লোলিত যৌবনাবেগ তাঁকে এক অপার্থিব আনন্দ-সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সে আনন্দে কূল নেই, তার বিস্তার আকাশের মতো, গভীরতা সমুদ্রের চেয়েও অতল।

সব মিলিয়ে তারা ছ'মাস একসঙ্গে ছিলো, তারপরই একদিন ডুব দিল রমেন।

দুই চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন মালতীদি। প্রথমে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, শেষে ভয়। হিম হ'য়ে জ'মে-যাওয়া একটা শক্ত ঠাণ্ডা ভয়। অনেক হাঁটলেন, খাটলেন, খুঁজলেন, খবর দিলেন পুলিশে, অনেক রাত কাটিয়ে দিলেন নির্ঘুম

চোখের অশ্রুধারায় বালিশ ভিজিয়ে, কিন্তু কোথায় রমেন? আর পাত্তা নেই তার।

সেই সময়ে মালতীদির অত্যন্ত শরীর খারাপ ছিলো। সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন তিনি। তিনি জানতেন না সন্তান যতই প্রণয়োৎপল হোক না কেন, অবিবাহিত মায়ের সন্তান হওয়া সমাজে মস্ত পাপ। বিয়ে না-ক'রে কোনোমতেই স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পাওয়া যায় না, আর স্বামী-স্ত্রী না হ'লে পিতামাতা হবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না সমাজে। অথচ যে-দু'জন বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে একবিন্দু মনের মিল নেই, যাদের শিশুরা নেহাৎ পশুবৃত্তি চরিতার্থতার ফল, সে দু'জনের শিশুরাও সমাজের মাথার মণি, কিন্তু এই শিশু অবৈধ ব'লে পরিত্যাজ্য। আর শিশুর কুমারী মা?

ভাবতে পারেন না মালতীদি। এবার যে তাঁর কী হবে, কেমন ক'রে বাঁচবেন, কেমন ক'রে মুখ দেখাবেন, কোন অবস্থায় কাদের কূলে তাঁর নতুন গতি হবে সে সব কথা চিন্তায় এলেও তিনি শিউরে ওঠেন। এতদিনে এই প্রথম যেন তিনি দুই চোখ মেলে ভালোমন্দ মিশিয়ে দেখতে পেলেন সংসারটাকে। তাঁর সরল সহজ বুদ্ধি এই প্রথম একটা প্রচণ্ড আঘাতে মুহ্যমান হ'য়ে রইলো।

ঠিক তিন দিন এইভাবে কেটেছিলো তারপর হঠাৎ এক সকালে আবার রমেন এসে হাজির। যেন কিছুই হয়নি এমনি তার ব্যবহার।

'কী হয়েছে? শুয়ে কেন? এতদিন পরে এলাম, চা'টা দাও।' অদ্ভুত এক দৃষ্টি মেলে তার সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মালতীদি।

রমেন চুলে আদর বুলোলো, ক্লান্ত চোখে চুমু খেলো, তারপর খুব নরম গলায় বললো, 'ভাবছিলে বুঝি?'

মালতীদি তেমনিই তাকিয়ে থাকতে থাকতে উচ্চারণ করলেন, 'ভাববো না?'

'কেন, ভাবনার কী আছে?'

'নেই?'

'কত কাজ ক'রে এলাম।'

'কাজ?'

মালতীদির কেমন স্তম্ভিত ভাব, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না রমেন

আবার ফিরে এসেছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্টটা হয়তো বুঝলো রমেন। কিছু না ব'লে জানালায় তাকিয়ে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল খানিকক্ষণের জন্য।

আস্তে-আস্তে দুপুরের শিউলির মতো একেবারে নেতিয়ে-পড়া একমুঠো মালতীদি উঠে বসলেন বাঁ হাতে ভর দিয়ে, কানের পাশে গড়িয়ে-যাওয়া চোখের জলের লম্বা রেখাটা চিকচিক ক'রে উঠলো, ডান হাতটা রমেনের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে দুঃখে বেদনায় ভেঙে পড়লেন বুকের উপর, 'তুমি কেন চ'লে গিয়েছিলে এমন ক'রে? কোথায় গিয়েছিলে? কোথায় গিয়েছিলে তুমি আমাকে ফেলে?' রমেন বিষণ্ণ হেসে মাথায় হাত রাখলো, 'কী বোকা! টাকাকড়ির জোগাড় লাগে না? তার ব্যবস্থায় গিয়েছিলুম।'

'এমন না-ব'লে না-ক'য়ে?'

'তাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে জিজ্ঞেস করছো?'

'একটু আত্মনির্ভর হ'তে শেখো মালতী। এমন তো হ'তে পারে বাকি জীবন একাই থাকতে হ'লো তোমাকে।'

'আমি ম'রে যাবো।' মালতীদি যে একটু ঝগড়াও করতে পারেন না রমেনের সঙ্গে। যেখানে তাঁর যথেষ্ট কঠিন হ'য়ে তিরস্কার করা উচিত ছিলো সেখানে তিনি শুধু কেঁদে ভাসালেন।

'ম'রে যাওয়া কি এতই সহজ, মালতী? দেখবে দিব্যি বেঁচে আছো। হয়তো বা আবার আর একজনকে ভালোবেসে মনে হচ্ছে—'

'ছি!'

গালে টোকা দিল রমেন, 'একদম ছেলেমানুষ।' তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'শোনো, আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে-টেয়ে নাও।'

ক-দিন খায়নি মালতী তা কি জানে রমেন?

আশ্চর্য! তা নিয়েও অভিমান করলেন না মালতীদি, রমেনের কথামতো উঠে হেঁটে খাওয়ার ব্যবস্থায় মনোযোগী হলেন। নিজের জন্য নয়, রমেনের জন্য। রমেনের উপর কোনোমতেই তিনি রাগ করতে পারেন না।

ঝিরঝির বৃষ্টি চলছিলো কদিন ধ'রে। আকাশের মুখ কালো শ্লেটের

মতো ল্যাপাপোঁছা ছিলো এ-কদিন। মালতীর মনের মতো অন্ধকারে নিরানন্দ হয়েছিলো এই শহরটা। আজ সুন্দর রোদ উঠলো।

আজ জানলা খুলে দিল মালতী, বিছানায় বাঁকা রেখায় কোন ফাঁক দিয়ে একটি লম্বা রোদের ফালি এসে আলোকিত করলো ঘর। ছোট্ট একটা উলের কোট গায়ে দিয়ে টুকটাক কাজ সেরে এবার একটু বিশ্রাম। বিশ্রাম নয়, শান্তি।

রমেন পায়ের উপর কম্বল টেনে মাথার তলায় দুই হাত দিয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে কী ভাবছিলো, মালতীকে পাশে অনুভব ক'রেই চকিত হ'য়ে উঠে বসলো, 'শুয়ো না, শুয়ো না, প্রস্তুত হ'য়ে নাও।'

'কিসের প্রস্তুত?' মালতীদি অবাক।

'সে-সব বলবো তোমাকে, এখন প্রস্তুত হ'য়ে নাও। বেরুতে হবে।'

'কোথায়?'

'হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে!'

রমেন অসহিষ্ণু হ'য়ে জিব আর তালুতে ঠেকিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করলো একটি, 'কথা বোলো না, সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছি, এবার দয়া ক'রে চলো।'

'হাসপাতালে গিয়ে আমি কী করবো?' এবার মালতীদিও একটু গোঁ ধরেন।

'কী আবার করবে। ডাক্তার দেখাবে।'

'তারপর?'

'তারপর ফিরে আসবে।'

'ও,' মালতীদি আশ্বস্ত হন, কিন্তু বিছানার আরাম ছেড়ে ওঠেন না।

'ওঠো!' হাত বাড়িয়ে রমেন কোটটা নিল হ্যাঙ্গার থেকে। মালতীদি বললেন, 'আজ থাক।'

না, না, ও আজই সারতে হবে।'

'সারাসারির কী আছে? কাল যাবো।'

'বেশ কথা। এদিকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে এসেছি না আমি? এটা কি তোমাদের কুমিল্লা নোয়াখালি নাকি? যখন খুশি আর যা খুশি করলেই হ'লো?'

অগত্যা উঠতেই হয় মালতীদিকে।

শরীরের কষ্টে, মনের কষ্টে এ কয়দিনেই মুখখানা তার নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না। আয়নায় দাঁড়িয়ে কোনোমতে সামান্য প্রসাধনটুকু সেরে নিলেন, তারপর রমেনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শাড়ি ছাড়তে আরম্ভ করলেন।

রমেন একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে বললো, 'আচ্ছা মালতী—'

'বলো।'

'ঠিক ক'মাস হ'লো তোমার?'

মালতীদি লাল হ'য়ে উঠলেন, জবাব দিলেন না। রমেনের একটুও লজ্জা নেই কেন?

'মাস তিনেকের বেশি না, না?'

'কী যেন, অতশত জানিনে।'

'ষোলো বছরের মেয়ের মতো করছো কেন?'

লজ্জার আবার বয়স আছে নাকি? মালতীদি ভাবলেন। যে-কথা লজ্জার তা তো সব বয়সে সকলের কাছেই লজ্জার। আর এ ব্যাপারটায় তো মালতীর রীতিমতো ঘাটের তলায় ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে।

'ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে ঠিকমতো বলতে পারবে তো?'

'আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

পাৎলা শাড়ির সিল্কের আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে শাড়ি পরা সমাপ্ত করলেন মালতীদি। তারপর জানলা বন্ধ করলেন, বিছানার ঢাকা টান করলেন, দরজায় চাবি লাগালেন, বেরিয়ে আসতে-আসতে প্রায় অপরাহ্ণ নামলো।

অপ্রসন্ন মুখে রমেন বললো, 'ঈশ। কত দেরি ক'রে ফেললে।'

এতক্ষণে কান্নার বদলে মুখ ভার করলেন মালতীদি, 'এতই যদি দেরির ভয় তবে নিজেই সকাল-সকাল এলে পারতে।'

'কত ঘুরেছি ক'দিন ভ'রে তা জানো?'

'ইয়েসপনসেবল্। ঘুরেছ সেটা কি আমার দোষ?'

'তবে কার?'

'স্বভাব। সত্যি ক'রে বলো তো কোথায় ছিলে এ-ক'দিন?'

'তোমাকে লুকিয়ে আর কোথাও বাস করবার মতো অন্যায় জায়গা আমার আছে নাকি?'

'নেই ব'লেই জানতাম। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'তোমার এই অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ আমি বুঝতে পারছিনে।'

'রাস্তায় বেরিয়ে আর কৈফিয়ৎ তলব কোরো না, আশা করি নিজে থেকেই বুঝতে পারবে সব।'

একটু চুপ ক'রে থেকে, অনেক সংকোচ কাটিয়ে মালতীদি বললেন, 'একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কী?'

'এ-ব্যাপারটায় তুমি একটুও সুখী হওনি, না?'

'বাজে কথা।'

'বাজে কেন? অন্তত এই মুহূর্তে এটাই তো সবচেয়ে জরুরি ব'লে মনে হচ্ছে আমার।'

'তোমার জরুরি তালিকায় আর কী-কী পড়ে?'

'প্রথমেই—' থামলো মালতী। হাজার বার বলা কথা আরেকবার বলতে দ্বিধা করলো, তারপর বললো, 'জানো তো অবিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর ছেলেমেয়ে—মানে—'

'বুঝেছি।' রমেন গম্ভীর।

'তাহ'লে নিজেদের জন্যে না হোক, ভবিষ্যৎ মানুষটির জন্যে নিশ্চয়ই একটা—'

'অনুষ্ঠান করা দরকার এই তো?' রমেন পাদপূরণ করলো, 'কিন্তু তার চেয়ে ভবিষ্যৎ মানুষগুলো না জন্মানোই কি ভালো নয়।'

'আহা, ভালো মন্দ যেন এখন নিজেদের মুঠোয়। যা হবার তা তো হ'য়েই গেছে।'

কী বলতে যাচ্ছিলো রমেন, বাসে উঠতে-উঠতে হারিয়ে গেল সে-কথা।

এর পরে কতদূর যে যেতে হ'লো কে জানে। বাস থেকে নেমে টিউব, টিউব থেকে ট্যাক্সি—ব'সে থেকে, হেঁটে, দাঁড়িয়ে কোমর ব্যথা হ'য়ে গেল

মালতীর। শহরে কি আর কোনো ডাক্তার বা হাসপাতাল ছিলো না? এ কোথায় কোন নির্জন প্রান্তরে রমেন নিয়ে এলো তাকে?

'অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা—' রমেন বললো, 'আরামে থাকবে।'

'থাকবো মানে?'

'থাকবে মানে—বাচ্চা জন্মাক আর না জন্মাক হাসপাতালেই তো আসতে হবে তোমাকে?'

'আজকে তো আর নয়?'

'শেষ যেখানে হবে শুরুটাও তো সেখানেই করা দরকার। চেনা-পরিচয় হ'য়ে থাকবে, রোগী তাদের আপনার জন হয়ে উঠবে।'

'তিন দিন ধ'রে কি এই-ই খুঁজেছ?'

'এই-ই খুঁজেছি। সবচেয়ে যে ব্যবস্থা ভালো, যা ভালো, তার জন্যেই এই কদিনের কষ্ট আমার।'

বুক থেকে অভিমানের মেঘ স'রে গিয়ে মনের আকাশ হালকা হ'লো মালতীর। একটু দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করেছে বটে রমেন, কিন্তু মালতীর চিন্তাতেই তো সময় কাটিয়েছে। তার জন্যই তো এত কষ্ট করেছে।

ঘন সবুজ মাঠের মধ্যে নিতান্ত নির্জন নিরালা একটা রঙিন ফুলের বাগান ঘেরা ছোট্ট কটেজের গেটের মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে রমেনের হাত জড়িয়ে ধরলো মালতী।

৫

এই নাকি হাসপাতাল? এমন ছোটো বাড়ি? এত অল্প লোক? তা হবে। হয়তো খুব দামি, তাই এমন একক ব্যবস্থা।

এক বুড়ি মেম এগিয়ে এলো সহাস্যে, হাতের দস্তানা দুটো প'রে নিতে-নিতে ভেতরে নিয়ে এলো তাদের। একটু দূরে গিয়ে কী জানি ফিশফিশ করলো রমেনের সঙ্গে, টাকা নিলো মুঠো ভ'রে, তারপর বললো, 'আজকের রাতটা তো থাকতে হয়'।

'কেন? থাকবো কেন?' মালতীদি রমেনের দিকে তাকালেন।

রমেন বললো, 'হয়তো দরকার।'

'ডাক্তার দেখাতে এসেছি, দেখিয়ে চ'লে যাবো। তাছাড়া এমন নয় যে হঠাৎ এসেছি, তুমি তো এঁদের ব'লেই গিয়েছিলে—'

'দেরি হ'য়ে গেছে বোধ হয়।'

মালতী অসহিষ্ণু হ'য়ে মাথা নাড়লো, 'না, না, থাকবো না আমি। আমার ভালো লাগছে না।'

চাপা গলায় তিরস্কার করলো রমেন, 'ছেলেমানুষি কোরো না। এই প্রথম বার। অনেক যত্ন নিতে হয়, অনেক কিছু ভাবতে হয়।'

'থাক, এঁদের কাছে আর যত্ন নিয়ে কাজ নেই আমার। মোটমাট রাত্তিরে থাকবো না আমি।'

'কেন?'

'না, না, আমার ভয় করে।'

'এই স্থাথো, ভয় কী? আমি তো আছি।'

'তুমিও থাকবে?'

'থাকবো না তো তোমাকে একা রেখে যাবো নাকি?'

এবার একটু ভাবলো মালতী, একটু ইতস্তত করলো।

রমেন বললো, 'সুন্দর জায়গা, আমার তো এমনিতেই লোভ হচ্ছে থাকতে।'

'তা হ'লে থাকো।'

'একটা ঘরের খাঁচা থেকে একেবারে আকাশের বাসা—' কম্পাউণ্ডের চারদিকে তাকালো রমেন, 'ভীষণ ভালো লেগেছে আমার জায়গাটা।'

'এতো যদি ভালো লাগে তাহ'লে গ্রামে থাকলেই হয়।'

'তা-ই থাকবো।' রমেন মালতীর সঙ্গে কথা রেখে পাশের অফিসরুমে গিয়ে ঢুকলো, কিন্তু বেরিয়ে এলো তক্ষুনি। বললো, 'এসো।'

সুন্দর ঘর। সাজানো-গুছোনো। নরম বিছানার আদর যেন হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মেইড এসে চা দিয়ে গেল দু'জনকে। ডাক্তার এসে নাড়ি টিপে দেখলেন, ইনজেকশন দিলেন দু'বার। বুড়ি মেম গল্প ক'রে গেল একচোট। একজন নার্স এসে ওষুধ খাইয়ে গেল একবার। সমস্ত পরিপাটি, সমস্ত নিঁখুত। রাত্তিরের খাওয়ারও এতটুকু নিন্দে করতে পারলো না মালতী।

'ইনজেকশন দিলো কেন?' ঘুমুতে-ঘুমুতে রমেনের গায়ে নিজের

শিথিল হাতখানা বিছিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো মালতী। রমেন বললো, 'তুমি ভারি দুর্বল।'

'রোজই দেবে নাকি?'

'তা কী জানি? দরকার হ'লে দিতে পারে।'

'রোজ আমাকে পাবে কোথায়?'

'পাবার দরকার কী? ইনজেকশন দিতে হ'লে কি শহরে আর কোনো ডাক্তার নেই? এরা প্রেসক্রপশন ক'রে দেবে।'

'তাই তো।' পরম নির্ভয়ে অনেকদিন পর অত্যন্ত নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে পড়লো মালতী। আর ঘুম ভাঙলো একেবারে সকাল সাতটায়। রমেন উঠে ব'সে দাড়ি কামাচ্ছে, জানলার কাচে পিছলে পড়ছে সূর্যের আলো, ফুলের গাছগুলো আন্দোলিত হচ্ছে হাওয়াতে, মালতী উঠে বসলো গা থেকে কম্বল সরিয়ে।

'ঘুম হ'লো?' মুখ না-ফিরিয়েই বললো রমেন।

'তুমি এত সকালে?' মালতী ওদেরই দেয়া ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে পায়ে স্যাণ্ডেল গলালো।

'নিজের বাড়ি নয় সে-থেয়ালটা ছিলো, তাই ঘুম ভেঙে গেল। মুখ ধুয়ে এসো, এর মধ্যেই বুড়ি এসে উঁকি মেরে গেছে দুবার। ডাক্তার নটার মধ্যে আসবেন।'

মালতী তাড়াতাড়ি ঢুকলো বাথরুমে। বেরিয়ে এসে দেখলো ব্রেকফাস্ট দেয়া হ'য়ে গেছে।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় নটার সময়েই ডাক পড়লো মালতীর। পরীক্ষার জন্য তোলা হ'লো তাকে লম্বা টেবিলে। টুপি-পরা লাল-মুখ দুজন নার্স দাঁড়িয়ে রইলো দু'পাশে, ডাক্তার এপ্রনের ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে কাছে এগিয়ে এলেন।

চুপচাপ। থমথম। বুকটা ঢিপঢিপ করলো মালতীর। কী জানি কেন।

মালতী জানতো না ডাক্তাররা মানুষকে কেমন ক'রে অজ্ঞান করে। যিনি বড়ো ডাক্তার তিনি তাকে দেখলেন ভালো ক'রে, ছোটো ডাক্তার তাঁর ইঙ্গিতে আবার ইনজেকশন দিলেন। তারপর মুখের উপর থপ্ ক'রে কী যেন পরিয়ে দিলেন একটা। তখন জানতেন না মালতীদি যে ওটার নাম

গ্যাস্-মাস্ক। পরে জেনেছিলেন। অবাক হ'য়ে ভয় পেয়ে ছটফট ক'রে উঠলেন তিনি। যতটা তার মনে পড়ে প্রাণপণে চিৎকার করেছিলেন বাঁচাও বাঁচাও ব'লে তারপরই গভীর ঘুমে ছেয়ে এলো শরীর। সুখের ঘুম। নিঃসাড়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

স্বপ্ন দেখেছিলেন একটা। কী স্বপ্ন মনে নেই স্পষ্ট, কিন্তু ভাবতে মন আকুল হ'য়ে ওঠে। একটা অদ্ভুত অনুভূতির শিহরণ ব'য়ে যায়। তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ছাড়া-ছাড়া, ভাসা-ভাসা। মস্ত এক সরোবর, তার জল গভীর নীল, অসংখ্য পদ্ম। পদ্মের মৃণালগুলো হঠাৎ সহস্র বাহু হ'য়ে তাকে ডাকলো, আর সেই হাতছানির আকর্ষণে সমস্ত পৃথিবী এগিয়ে এলো কাছে। আকাশ নেমে এলো, আকাশের পাখিরা পাখা মুড়ে টুপ ক'রে ডুব দিল জলে, আর সেই ডুবে যাওয়ার শব্দ থেকে সৃষ্টি হ'লো এক সুরতরঙ্গ। সেই তরঙ্গ অন্ধ ভ্রমরের মতো গুনগুন আওয়াজে বাতাসে ভাসতে লাগলো ঢেউয়ের মতো কেঁপে-কেঁপে। তারপর মিশে গেল কোথায়।

এই অপূর্ব, ঐশ্বরিক অভিজ্ঞানের জন্য মালতীদি সত্যিই কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন রমেনের উপর। রমেনই তো একমাত্র মানুষ, যে তাকে এই সুসময় নিয়ে যেতে পারে, এমন স্বপ্ন দেখাতে পারে।

৬

যখন চোখ মেলে তাকালেন সূর্যে ঝিম ধরেছে। মধ্যাহ্নের আবেশে, কেবল স্থির, অচঞ্চল, অবিকৃত একটা প্রচণ্ড তাপ। এই সময়ে সমস্ত জ্যোতি নিয়ে, আগুন নিয়ে সূর্যদেব ঘুমোন একটু, তারপরই অপরাহ্ণ নামে, তিনি পাশ ফেরেন। তারপর পাটে যাবার আগে মেজাজ ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে তাঁর, সন্ধিক্ষণ আসে, তিনি মিলিত হন রাত্রির সঙ্গে।

মালতীদির শরীরেও ঝিম ছিলো তখন, চোখ চেয়ে তাকালেও ঘুমের ঘোর ছিলো, বুদ্ধি বোবা ছিলো। রমেনকেই দেখেছিলেন তিনি, মুখের উপর ঝুঁকে আছে। 'কী! কী! কেমন আছ?'

মালতীদি ঠোঁট নেড়েছিলেন, কথা ফোটে নি। সেই ঘোর কাটতে সময় লেগেছিলো তাঁর। সেই রাতটাও সেই কটেজেই কাটিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ জেগে উঠতে-উঠতে পরের দিন আবার মধ্যাহ্ন।

'ব্যাপার কী বলো তো?' অবাক হ'য়ে রমেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আমাকে ওরা অজ্ঞান ক'রে নিল কেন?'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে রমেন বললো, 'ইনটারনেল পরীক্ষার আজকাল এ-ই আধুনিকতম পদ্ধতি।'

রমেন সিগারেট খায় না বেশি। বেশি কেন, প্রায় 'না'র মধ্যেই ধরা যায়। নেশার ধাত নেই তার। পান করতেও পটু নয়। খুব ভালো কিছু না হ'লে সেদিকে তাকায় না। মনের বিশেষ কোনো অবস্থার প্রতীক তার এই সব।

মালতী বললো, 'বাজে কথা।'

'বাজে কি কাজের দু'চার দিন বাদেই বুঝবে।'

মনে মনে সন্দেহ হচ্ছে মালতীর, চোখে চোখ রেখে সে স্থির রইলো। রমেন দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। ফিরলো একটু পরেই। 'এবার তাহ'লে যাবার ব্যবস্থা করি, কী বলো?'

'সত্যি ক'রে বলো তো আমাকে কী করা হ'লো?'

'কী আবার।'

'এই বুড়ি এখানে, শহর থেকে বাইরে, এতদূরে কিসের হাসপাতাল পেতে বসেছে?'

'বলছো কী তুমি?'

'জিজ্ঞেস করছি আমাকে এখানে এনে এদের দিয়ে তুমি কী করালে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে রমেন বললো, 'যা ভালো—'

'রমেন, বলো, সত্য কথা বলো।'

মালতীর মুখোমুখি দাঁড়ালো রমেন, মাথার উপর আস্তে হাত রেখে তার চেয়েও আস্তে বললো, 'তোমাকে অব্যাহতি দিলাম।'

'অব্যাহতি!'

'হ্যাঁ, মালতী।'

'কী থেকে তুমি আমাকে অব্যাহতি দিলে?'

'বন্ধন থেকে।'

'আমার সব বন্ধন তো তুমিই, তুমি ছাড়া আর আমার কী আছে?'

'তা হ'লে তা-ই।'

'তা-ই? বলতে পারলে এ-কথা? তবে আমার কী থাকলো?'

'সব। যেমন ছিলে, আবার তেমনি হ'লে।'

দুর্বলমাথায় রমেনের কথা ঝাপসা লাগে মালতীর, ছটফট ক'রে ওঠে, কী যেন বুঝে-বুঝেও বোঝে না।

রমেন আদর করলো, 'আর কথা না, লক্ষ্মীটি। একটু চুপচাপ থাকো, আমি যাবার বন্দোবস্ত করি।' মালতী চুপ ক'রে চোখ বুজলো, তার শক্তি ছিলো না।

সম্পূর্ণটা রাস্তা ট্যাক্সি ক'রেই ফিরতে হ'লো। মালতীর এই শরীরে উপায় ছিলো না তাছাড়া। খরচ হ'লো যথেষ্ট। কী আর করা, খরচের পাল্লাতেই পড়েছে রমেন। তা যা-ই হোক টাকার তার অভাব নেই, টাকার বিনিময়ে যে এত বড়ো একটা দায় থেকে সে মুক্তি পেলো মনে মনে বোধহয় তারজন্যেই শত শতবার ধন্যবাদ দিলো ঈশ্বরকে। কিংবা বিজ্ঞানকে।

বাড়ি ফিরে কিন্তু মালতীদি আর একটিও কথা বললেন না রমেনের সঙ্গে, রমেনও তাই নিয়ে কিছু ব্যস্ত করলো না নিজেকে, বরং এড়িয়ে চলতে পেরেই যেন বাঁচলো। একটা চাপা দম-বন্ধ-করা গুমোট হাওয়া। আবার মাঝখানের টেবিলের দু'পাশের খাটে দু'জনের বিছানা পড়লো নতুন ক'রে। তারপর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সম্বন্ধ ক্ষীণ হ'য়ে এলো। সন্তান উৎপাটনের কারণটা বুঝেছিলেন মালতীদি। বুঝেছিলেন রমেনের ধাতই এই নয় যে একটা মানুষের সঙ্গেই সে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারে সারাজীবন। ছোটো জলার ব্যাং নাকি সে? তার প্রেমের বিস্তার যে আকাশের চেয়েও বিশাল। স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান অসহ্য তার পক্ষে। নিত্য নতুন মেয়ের প্রেমে সে ভেসে বেড়াতে চায় অবাধ স্রোতে। বিয়ের বন্ধনেও তার অনীহার এই একমাত্র কারণ। স্বামী হ'তেই যার এতো আপত্তি সে আর পিতা হবে কেমন ক'রে!

তবে আর কেন?

এর পরে মালতীদি নিজে থেকেই স'রে গেলেন একদিন।

এত সব কথা মালতীদি নিজে আমাকে বলেননি, বলেছিলো মঞ্জুশ্রী। মঞ্জু আরো বলেছিলো, রমেনকে নাকি সে নিজেও দেখেছে। সত্যি বলতে কী, কোন এক সময়ে কলকাতায় তিনমাসের বসবাসে রমেনকে দেখে তারও মূর্ছা যাবার

দশা হয়েছিলো। এমনও হয়েছিলো যে মনে-মনে এই লোকটিকে নিয়ে খেলা করতেই তার বেশ ভালো লাগতো। অমন সুন্দর রমেন যে মালতীদির সঙ্গে এমন একটা বিশ্বাসহন্তার পার্ট করেছে ভাবতেই অবাক লাগে। আর করেছে কিনা তা-ই বা কে জানে। লেখাপড়া শিখলে কী হবে, মালতীদিটা একটা বোকা। কেন রে বাপু, না-হয় বাচ্চা না-ই হ'তো, পছন্দ যখন করে না। তাই ব'লে অত মান দেখিয়ে চ'লে আসবার দরকারটা কী?

সঙ্গে-সঙ্গে এইসব বলেছিলো মঞ্জুশ্রী।

এক শাঁখার গল্প শুনতে গিয়ে এতো। অথচ এ-সবের ফাঁকে শাঁখাটা কবে আর কখন যে রমেন মালতীদিকে পরিয়েছিলো তা-ই আর জানা হ'লো না।

অনেক বর্ষার দিনে আমি আর মালতীদি একসঙ্গে ভিজেছি, অনেক গরমের রাতে আমি আর মালতীদি সারারাত পাশাপাশি ছাতে শুয়ে গল্প করেছি, চৈত্রের পাতা-ঝরা সন্ধ্যার উতল হাওয়ায় কবিতা পড়েছি একসঙ্গে, শীতের দিনের কত রোদ্দুর-জ্বলা উত্তপ্ত সকালে রমনার মাঠে হেঁটে বেড়িয়েছি—গান করেছি, চুপ ক'রে থেকেছি, উদ্দাম তর্কে ঘর ভ'রে দিয়েছি, সব—সব আমার মালতীদির সঙ্গে। আমার সেই বয়েসটা আর সেই সময়টা শুধু মালতীদিতেই রঙিন। আমার আটাশ বছর বয়সের বন্ধু, আমার গুরু, আদর্শ, আমার পরম আত্মীয়। আমার সোনামোড়া দিনগুলোর একমাত্র সঙ্গী। মালতীদিকে ভালোবেসে আমি ভালোবাসার গভীরতা জেনেছিলুম, পবিত্রতা জেনেছিলুম, আমি তাঁকে ঈশ্বরের মতো ভালোবাসতুম, আমার চোখে মালতীদির চাইতে সুন্দর আর ভালো আর মধুর কী ছিলো তখন?

ঢাকাতে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ইডেন কলেজের প্রোফেসরি। মাত্রই বছরখানেক ছিলেন। তারপর মন ঘুরলো তাঁর।

আলাদা ছোট্ট একটা বাড়ি নিয়ে ছিলেন পুরানা পল্টনে। সামনে বাখারির বেড়া-দেয়া বাগান ছিলো একটুখানি, বাগানে প্রজাপতি উড়তো, গেটের মাধবীলতার ঝোপে সন্ধ্যাবেলা জোনাকি জ্বলতো। দক্ষিনের খোলা বারান্দায়, বেতের চেয়ারে টেবিলে ব'সে ব'সে তিনি কাজ করতেন, অবসর সময়ে ডেক-চেয়ারে এলিয়ে বিশ্রাম করতে-করতে বই পড়তেন আর আমাকে

দেখলে আলো হ'য়ে উঠতো মুখ। বুড়ি দাই ব'সে-ব'সে তকলি কাটতো আর গল্প করতো। একবার মহাত্মাজিকে দেখেছিলো সে, সেই গল্প।

কিন্তু তবু মন টিঁকলো না। মঞ্জু বললো, 'টিঁকবে কী? মালতীদির কি কোনো লজ্জা আছে? আবার যে রমনের সঙ্গে গল্পালাপ চলছিলো।'

'তাই নাকি?' কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলাম, খুশিও। ভালোই তো। যাকে এতো ভালোবাসেন মালতীদি, এতো কিছুর পরেও যার দেয়া শাঁখার বাঁধনটি তিনি কিছুতেই খুলে ফেলতে পারেননি, তার সঙ্গে যদি আবার ওঁর একটা মিটমাট হ'য়ে পুনর্মিলন ঘ'টে যায়—

'এদিকে ভাখ,' মঞ্জু মুখর হ'য়ে ওঠে বিরক্তিতে, 'ওর জন্যেই তো মালতীদির এত কষ্ট? বিলেতের দিনগুলো শেষে যে কী সাংঘাতিক হ'য়ে উঠেছিলো তা তো জানিস না? কী লজ্জা, কী লজ্জা! ঘটনাটা সবাই জেনে ফেলেছিলো কিনা। কোনো বাঙালি ছেলেমেয়েরা তো মিশতোই না, দেখলে ফিক ক'রে হাসতো, কানাকানি করতো, গা টিপতো, এমন কি বাঙালি ছাড়াও ভারতীয় অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা—'

'ভীষণ অন্যায়!' রেগে উঠে বললুম, 'এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েও যদি ঘোঁট পাকাবে তবে কূপমণ্ডূকগুলো বিদেশে গিয়েছিলো কেন?'

'তা কী করবি?' মঞ্জুশ্রী চোখ টান করলো, 'তোর না-হয় অতি প্রিয় মালতীদি, তাই ব'লে সবার তো আর নয়? সবাই ক্ষমা করবে কেন এই অন্যায়?'

'কী অন্যায়?'

'কী না? একটা ছাত্রী, পড়তে গেছে কত কষ্ট ক'রে, পড়াশুনো করো। তা নয়, প্রেম। আর প্রেমও কি যেমন তেমন? বাচ্চা হবার দরকার ছিলো কী?'

'বা রে। বাচ্চা হবে না?'

'কেন হবে? ওরা কি বিয়ে করেছিলো?'

'ভালো তো বেসেছিলো!'

'ভালোবাসলেই হ'লো?'

'তবে আবার কী? ভালোবাসে ব'লেই তো তাদের ছেলেমেয়ে হয়।'

'ক্যাবলামি করিস না। মালতীদি কুমারী ছিলেন না!'

'আহা, কুমারী আবার কোথায়? একসঙ্গে তো ছিলেন।'

'সেটাই তো যথেষ্ট অন্যায় হয়েছিলো।'

'সাক্ষীসাবুদের কথা তো আর হচ্ছে না, আইনের কথাও নয়, যারা দু'জন দু'জনকে অত ভালোবাসে সেখানে তাদের বাচ্চা হবেই। এখন রমেন একটা স্কাউনড্রেল, তাই—'

'তা অবশ্য বলতে পারিস।' মঞ্জুশ্রী কী জানি কী ভেবে গলার স্বর নামালো, সহানুভূতির সুরে বললো, 'মালতীদির নেহাৎই মনের জোর ছিলো, তা নৈলে ঐ কষ্টকে জয় ক'রে ঐ দুর্নামকে তুচ্ছ ক'রে ঠিকঠাক ফিরে তো এলো? অবিশ্যি বাপ মাকে সর্বস্বান্ত ক'রে ছেড়েছে, ডিগ্রিটাও পায়নি। রাধামোহন-কাকার অমন অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণই তো মালতীদি।'

'মালতীদির বাবা মারা গেছেন?'

'কবেই তো। কিন্তু কী ভালোই বাসতেন মেয়েকে।'

'এখন বুঝি আবার রমেনের জন্যই কলকাতা গেলেন?'

'তা ছাড়া আবার কী?'

'কই, আমাকে তো বলেননি।'

'আমাকেই কি বলেছেন? আমি আন্দাজেই বুঝেছি। কী সুন্দর নিরিবিলি ছিলেন, শান্তিতে ছিলেন। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

মঞ্জু বললো, 'কৈফিয়ৎ অবিশ্যি দিয়েছেন একটা। এর চেয়েও নাকি ভালো চাকরি পেয়েছেন তাই যাচ্ছেন। ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে। ভেবে ছাখ, মালতীদির মতো মেয়ে কাজ করবেন ইনশিওরেন্সে। কী বুদ্ধি, কী যুক্তি।'

আমিও ভাবলাম সে-কথা। মালতীদির মতো ছোট্টোখাট্টো একটুখানি একটা মানুষ, আর যা ভালোমানুষ, তিনি কী করবেন ওসব চাকরির ঝামেলায় গিয়ে!

বললুম, 'ওঁর পক্ষে কলেজের কাজই সবচেয়ে যোগ্য ছিলো। লিখতেন টিখতেন—'

'আর লেখা! রমেনই ওর মহাকাল।'

'রমেনের সঙ্গে আবার নতুন ক'রে পত্রালাপ আরম্ভ হ'লো কী ক'রে?'

'ভগবান জানেন। শেষের দিকে তো দেখেছি দিনরাতই চিঠি লেখার পালা। রমেনও লিখতো, মালতীদিও লিখতেন।'

'কই, আমি তো কখনো—'

'তুই কী জানবি!' বাধা দিল মঞ্জুশ্রী, 'দাইটা দেশে গেল পরে আমি ছিলুম না কদিন? তখন দেখেছি রোজ চিঠি আসছে মালতীদির নামে, আর ঘুম থেকে উঠে চা খেয়েই তার জবাব লিখতে বসেছেন মালতীদি।'

'তা যে রমেনেরই চিঠি সেটা তো আর জানিস না?'

'কেন জানবো না? জিজ্ঞেস করেছি না? মালতীদি নিজে বলেছেন রমেনের চিঠি।'

মনটা হঠাৎ খারাপ হ'য়ে গেল। এতো ভালোবাসা, এতো বন্ধুতা, সারাদিন এতো একসঙ্গে থাকার ঘটা, অথচ আমাকে বলেননি এত বড়ো খবরটি? আমি এতোই পর? এতোই দূর?

কলকাতা গিয়েও মালতীদি নিয়মিত চিঠি লিখছিলেন আমাকে, আমিও ঠিকমতো জবাব দিচ্ছিলুম, এর পরে সেটা কয়েক ফোঁটা চোখের জলে সমাপ্ত হ'লো। আমি অভিমান ক'রে বন্ধ ক'রে দিলুম জবাব দেয়া।

৭

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত—আস্তে আস্তে চাকায় ঘুরে ঘুরে কতবার ক'রে পার হ'লো কত ঋতু। মালতীদির বিচ্ছেদের বেদনার উপর আস্তে-আস্তে এক এক পল্লা বিস্মৃতির পলিমাটি পড়তে লাগলো। দেখতে-দেখতে পুরু হ'য়ে উঠলো সে-আস্তরণ। আমাদের চিঠি-লেখালেখি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে ডুবে গেল একদিন, ভুলে গেলুম সব কথা, এমনকি তাঁর ঠিকানাও হারিয়ে গেল কবে। আর তারপর প্রায় ছ'বছর পরে আবার আমার সঙ্গে দেখা হ'লো মালতীদির।

ততদিনের জীবনের পরিবর্তন হ'য়ে গেছে অনেক, অনেক বয়স বেড়েছে, অনেক দায়িত্বও। স্ত্রী হয়েছি, মা হ'য়েছি, ঢাকা ছেড়ে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়েছি, আরো কত কী। গিরিডিতে বেড়াতে এসেছিলুম পুজোর ছুটিতে, সঙ্গে লোকজন নিয়ে এসেছি, সুন্দর একটি বাড়ি পেয়েছি, আর সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি কাজে অকাজে। এরই মধ্যে কোনো এক পরিচিত

বাড়িতে বিকেলের চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখি মালতীদি। আমি অবাক। ঠিক তেমনি করমচা ছাঁদের চোখে মিষ্টি হাসি, তেমনি চিনেদের মতো হলদেটে গায়ের রং, তেমনি ছেলেমানুষ চেহারা। এলোমেলো ঘন চুলে মাথা ঝাঁকালেন তারপর দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। আর জড়িয়ে ধরার প্রবল আকর্ষণে বুঝলাম আমাকে তিনি ভোলেননি। চোখে জল এসে গেল।

'ভালো আছিস ?'

অভিমান ক'রে বললুম, 'জেনে দরকার আছে কিছু ?'

'নেই বুঝি ? সব জানি। বিয়ে করেছিস তা জানি, মেয়ে হয়েছে তা জানি, মেয়ের নাম মালতী রেখেছিস তা-ও জানি। কিন্তু মালতী রেখেছিস কেন রে ?

'মালতী তো নয়, মধুমালতী।'

'ঐ হয়েছে। প্রথমে ওরকমই মধুটধু একটা থাকে, শেষে মালতীতেই মিশে যায়।'

'মালতীতেই মিশুক, বোধ হয় তাই চেয়েছি।'

'তাই চেয়েছিস ?' একটা নিশ্বাস ছাড়লেন মালতীদি, 'তবে তুই দেখছি আমাকে একেবারে ভুলে যাসনি।'

'পাছে ভুলে যাই সেজন্যেই নামটা জপ করছি মেয়েকে ডেকে-ডেকে।' আমি হাসলাম। মালতীদিও হাসলেন।

'ভুলে গেলে হাজার বার উচ্চারণেও আর সেই সুর ফোটে না তা বুঝি জানিস না ?'

এবার স্বীকার করলাম কন্যার নামকরণের ভারটা ঠিক আমার উপরে ছিলো না। ওটা ওর বাবারই ফেভরিট নাম। আমার নাম মণিমালা অতএব মেয়ের নাম মধুমালতী। দুটো ম, শুনতে নাকি ভীষণ মিষ্টি।

'তাই বল।' মালতীদি আদর ক'রে কাছে বসালেন, সব পরিবেশ ভুলে (যা তাঁর স্বভাব) একাগ্র হ'য়ে উঠলেন আমাকে নিয়ে।

আশ্চর্য ! এতোদিন এতো কিছুর পরেও দু'চার দিনের মধ্যে আবার আমরা তেমনিই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। মালতীদিকে ধ'রে নিয়ে এলাম নিজের বাড়িতে, স্বামীকে লিখলাম, 'তুমি চ'লে যাবার পরে ভেবেছিলাম অধিক স্বাস্থ্য-

সঞ্চয়ে আর আমার কর্ম নেই, তোমারই যখন পুরো একটা মাস থাকার ছুটি জুটলো না তখন সেই ছুটি আর ঠাকুর চাকর নিয়ে আমি ভোগ করি কোন লজ্জায়। পাত্তাড়ি গুটোবার চেষ্টা করছিলুম। এমন সময় মালতীদির সঙ্গে দেখা। ঠিক সেই মালতীদি। আর মালতীদির সঙ্গে আমার ইতিহাস তোমার অবিদিত নেই। সবচেয়ে যেটা অবাক-করা কথা, সেটা হচ্ছে মালতীদিকে আমার ঠিক তেমনিই ভালো লাগছে। তাই ভাবছি বাড়িটা যখন আগাম ভাড়া নেয়াই গেছে একবার, রেল কোম্পানিকে অতগুলো টাকা দিয়ে যখন একবার এসেই পড়েছি এতোগুলো লোক, তখন না-হয় থেকেই যাই পুরো সময়টা।

উশ্রির ধারে বেড়াতে-বেড়াতে একদিন বললুম, 'আবার আপনি রমেন সেনের জন্য কলকাতা এসেছিলেন ?'

চোখ বাঁকিয়ে মালতীদি বললেন, 'ধ্যেৎ। কে বললে ?'

'ভাবছেন আপনি বলেননি ব'লেই আমি আর কিছু জানিনে, না ?'

'কিছু জানিস না।'

'সব জানি।'

'তা হ'লে সেই রাগেই তুই আর চিঠি লিখিসনি ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা হিংসুক তো তুই ?'

'হিংসে আবার কী ? রীতিমতো রাগ হয়েছিলো আমার।'

'কেন ?'

'আপনার যে একটা সামান্য আত্মসম্মানজ্ঞানও নেই এটা ভাবলেই আমার—'

'আত্মসম্মান !' মালতীদি তাঁর ছোটো ভেসে-থাকা নীল চোখ তুলে আকাশে তাকালেন।

আমি উত্তেজিত হ'য়ে বললাম, 'যতো দুঃখ তো আপনার ওর জন্যই।'

মালতীদি আস্তে বললেন, 'জানি।'

'তবে ?'

'সে তুই বুঝবিনে।'

'কেন বুঝবো না ?'

'তুই তোর স্বামীকে ভালোবাসিস তো ?'

'তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।'

'একবার ভালোবাসলে কি আর তার মুক্তি আছে রে ?'

'ওর আছে আর আপনার নেই, না ?'

'কী আর করা।'

'আমি হ'লে—'

'ভুল বলছিস। যতক্ষণ ভালোবাসা আছে ততক্ষণ কিছুই করবার থাকে না।'

'ভালোবাসা না ছাই। অমন লোককে আবার কেউ ভালোবাসতে পারে।'

মালতীদি তেমনি তাকিয়ে রইলেন আকাশে।

আমি বললুম, 'এবার আপনি বিয়ে করুন।'

'দে না একটা খুঁজে-পেতে।' আত্মস্থ হ'য়ে হাসলেন মালতীদি।

'দেবো।' মালতীদির একটা নরম হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, 'ঠাট্টা নয়। বিয়ে না-করলে সংসারের সুখ কী তা আপনি বুঝবেন না। একজন ভদ্র, সুস্থ, সজ্জন, ভালো স্বামী যে মেয়েদের জীবনে কতখানি তা আপনি তখুনি জানবেন যখন তাকে পাবেন।'

'পাওয়া না-পাওয়া কি আমার হাতে ?'

'নিশ্চয়ই। যে যা চায় সে তাই পায়।'

'যুক্তিতে হেরে গেলি। যদি ভেসে বেড়ানো মানুষই আমি ভালোবাসি তাহ'লে তাকে তো পাওয়াই গেছে।'

'পাওয়া ? যে-মানুষ স্ত্রীকে স্ত্রীর সম্মান দেয় না, মা হবার আস্বাদ দেয় না তার নাম মানুষ ? তাকে আবার পাওয়া ?'

মালতীদির মুখে বিকেলের ছায়া, হাসিটি করুণ দেখালো।

'বসন্ত ক্ষণিক। সেই ক্ষণিকতাটুকুই তার মাধুর্য ! কেবলই কি কচি পাতার কলরোল ? ফুল চাই না ? ফল চাই না ? তেমনি প্রেমিকাও স্ত্রী হয়, স্ত্রী-ই মা হয়। রমেনের কাছে আপনার তবে কিসের প্রত্যাশা ? কী পাবেন ?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মালতীদি, 'আমিও মাঝে-মাঝে তাই ভাবি। কিন্তু বারে-বারে রমেন আমাকে লক্ষ্যচ্যুত করে।'

'আপনার সেটুকু মনের জোর নেই ?'

'ও ডাকলে আমি থাকতে পারি না।' মালতীদির গলা বর্ষার বাতাসের মতো ভেজা, 'আমি বড়ো দুর্বল।'

আমার কষ্ট হ'লো এরপরে তর্ক করতে, একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'উনি এখন কোথায় ?'

'সন্ন্যাসী হয়েছে।'

'সন্ন্যাসী !' চমকে উঠলাম, 'মানে ?'

'মানে, ভগবানকে পাবার চেষ্টা করছে।'

'সে কী ?'

'আমি কলকাতা আসবার পরে ছ'মাস, আট মাস বেশ ছিলো, তারপরেই আবার দেখলাম মেয়ে বন্ধু নিয়ে ঘুরে বেড়ানো শুরু হয়েছে।'

'যা-তা ! আপনি কিছু বললেন না ?'

'অসহ্য হ'য়ে ঝগড়া করলুম একদিন। সেই যে ডুবলো আর পেলুম না। ও ওইরকমই।'

'ওইরকমই !' মালতীদির নিস্তেজ গলায় আমি তাজ্জব। রেগে বললুম, 'ওকে আপনার জেল দেয়া উচিত, ওর উপর প্রতিহিংসা ব্রত গ্রহণ করা উচিত।'

'না রে, ওর কোনো দোষ নেই, দোষ আমার অদৃষ্টের। শূন্য বাড়িতে সে-কথাটাই ভাবছিলাম ব'সে-ব'সে, হঠাৎ দেখি আবার একদিন হাজির হয়েছে এসে। কী ? না, সে সন্ন্যাসী হচ্ছে। গুরুর সঙ্গে দেরাদুন যাচ্ছে দীক্ষা নিয়ে। ওর চোখের দৃষ্টি নিষ্পাপ, মুখের দিকে তাকালে আমি পৃথিবী ভুলে যাই, ওর দোষগুণ সব মিথ্যা হ'য়ে যায় আমার কাছে। কেঁদে ফেলে বললুম, "রমেন, আমার কথা কি তুমি কখনো ভাবো না ?" বললো, "ভাবি।"

'তবে ?'

চুপ ক'রে রইলো। আমি ওর পা ভাসিয়ে দিলুম চোখের জলে, বললুম, 'তবে আমাকেও নাও।'

পা সরিয়ে নিয়ে বললো, 'কোনো বন্ধন স্বীকার করাই আমার অভ্যাস

নয় মালতী, একমাত্র তুমিই আমাকে বারে-বারে বাঁধো। আমাকে ভুলে যাও তুমি।'

'নিষ্ঠুর, এই কি তোমার কথা?'

'এই আমার একমাত্র কথা।'

'তুমি কি মানুষ?'

'কী করবো, বিধাতাই আমাকে এমন ক'রে গড়েছেন।'

'বিধাতার দোষ দিয়ো না। বিধাতা নিজেও তোমার মতো পাথর নন।'

'হয়তো তা-ই। সত্যি কথা বললে আঘাত পাবে, তবু বলি তোমাকে আমার ভালো লাগে কিন্তু ভালো আমি বাসি না।'

এ-কথা শুনে বুকটা যেন বন্ধ হ'য়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস নিতে পারলুম না। শান্ত হ'য়ে উঠে বসলাম ধীরে-ধীরে, বললাম, 'কাকে ভালোবাসো?'

'কাউকেই না। ভালোবাসতে আমি শিখিনি।'

'তাই বুঝি এতকাল পরে ঈশ্বরকে ভালবেসে ভালোবাসা অভ্যেস করবে?'

রমেন হাসলো, 'কে জানে, তাঁকে বাসবো ব'লেই হয়তো এতোদিন অপেক্ষা করেছিলাম। হয়তো এতোদিনের এই তোমরা পাঁচজনই আমার অভ্যেসের চর্চা, এই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপলক্ষ্য।'

'এতো বুক মাড়িয়ে কোন লক্ষ্যে তুমি পৌঁছবে রমেন?'

'বিষ্ণুবক্ষই একমাত্র বক্ষ মালতী, সেই বক্ষ থেকেই মৃণালের জন্ম, আর তো সব তৃণদল।'

আমি আর কথা বলতে পারলাম না, আমার বুকের ভেতরকার হাড় পাঁজরা যেন ভেঙে গেল, যেন স্নায়ুতন্ত্রী সব কে ছিঁড়ে দিল এক টানে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজা ধ'রে, সে হাসতে-হাসতে সন্ন্যাসী হ'তে চলে গেলো।'

মালতীদি চুপ করলেন।

বিকেল আঁধার হ'য়ে এলো, আকাশে তারা ফুটে উঠলো একটি দুটি ক'রে, পেছনে উশ্রীর শীর্ণ রেখা প'ড়ে রইলো রুপোর পাত হ'য়ে, ফিরে আসতে-আসতে অনেক পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কদ্দিন হ'লো গিয়েছেন?'

'চার বছর।'

'চা-র বছর!'

'চার বছর।'

'এতদিন পরেও আপনি তাকে ভুলতে পারেননি?'

'না।'

'খবর টবর নেয়?'

'নিতো না, কিন্তু আবার ডাক পড়েছে তাঁর।'

'ডাক পড়েছে মানে?'

'বলছে, আমার আশ্রমে এসো, শান্তি পাবে।'

'আপনি শান্ত না অশান্ত সে-খবরটি কে জানালো তাকে?'

'জানি না।'

'আপনিই নিশ্চয় চিঠি লিখেছিলেন।'

'না।'

'সে যাবার পরে এই তার প্রথম খবর?'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে আর চিঠিপত্র লেখেনি?'

'না।'

'আপনিও না?'

'আমি লিখেছিলাম প্রথম-প্রথম কয়েকখানা, সে জবাব দেয়নি।'

'আপনিই বা লিখতে গিয়েছিলেন কেন?'

'টিঁকতে পারতুম না, পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতাম এখানে ওখানে, শেষে চিঠি লিখলে যেন অবসান হ'তো একটা, দুঃখের একটানা রেলগাড়িটা একটু থামতো হাঁপ নিতে। ওষুধ খেয়ে ঘুমের মতো।'

'কী অদ্ভুত।'

'কিন্তু জবাব না দিয়ে ভালোই করেছিলো, ভুলেই গিয়েছিলুম প্রায়। এর মধ্যে মা মারা গেলেন, ছোট বোন দুটির বিয়ে হ'য়ে গেল, আমিও যেন মাটি পেলুম পায়ের তলায়—'

'তারপর?'

'তারপর?' ঢোঁক গিললেন মালতীদি, 'আখ তো দেখি কী কাণ্ড—' সলজ্জ ভঙ্গিতে মুখ নামালেন তিনি।

'কাণ্ড আবার কী?' রীতিমতো রাগ হ'লো আমার, 'আপনি আবার তাই ব'লে সন্ন্যাসিনী হ'তে ছুটবেন নাকি?'

'না, না, ছুটবো কেন? তবে ভাবছি কী—' মালতীদি ইতস্তত ক'রে বললেন, 'একবার দেখে এলে হয় ব্যাপারটা কী।'

'কক্ষনো না।'

'আমি কি ওর জন্যে যাবো? এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন—'

'যাক।'

'অত ভাবছিস কী বোকা? তুই বুঝি ভাবিস ইচ্ছে হ'লেই সন্ন্যাসিনী হওয়া যায়? নেহাৎ কৌতূহল একটা।'

বুঝলাম আবার আগুনে হাত দিতে সাধ হ'য়েছে মালতীদির, আবার রমেন তাঁকে দুঃখ দিতে পণ করেছে।

৮

এর কয়েকদিন পরেই আমি গিরিডি ছেড়েছিলাম। মালতীদি রইলেন। ওঁর কোন এক জমিদার আত্মীয় বা বন্ধু ভদ্রলোকের বাড়ি ছিলো সেখানে। বয় বেয়ারা দরোয়ান সবই ছিলো। আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি, আমি চ'লে আসার পর আবার সেখানেই চ'লে গেলেন। আমি চিঠি লিখেছিলাম এসে, কলকাতা এলে দেখা করতে লিখেছিলাম, লিখেছিলাম কোনোরকমেই যেন তিনি আবার রমেনের কাছে না যান, কৌতূহল-বশতও না। কিন্তু তিনি আমার কথা রাখেন নি। এমন কি মাত্র একখানা পোস্টকার্ডে একবার দু'টি লাইন কুশল প্রার্থনা ছাড়া অন্য চিঠিও লেখেননি আমাকে। আমিও অভিমানবশত আর লিখলাম না। এর পরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেলো, স্মৃতির উপর আবার পলিমাটি জমলো, নিজের সুখদুঃখ সংসার স্বামী সন্তান এ-সবের বেড়াজালে ভুলেই গিয়েছিলাম মানুষটিকে। অবিশ্যি উড়ো খবর যে দু'চারটা ছিটকে এসে না পড়তো তা নয়, কলকাতা শহরের ট্রামে বাসে, এখানে ওখানে, কত আত্মীয় কত কুটুম্ব আর কতো যে বন্ধু ছড়ানো থাকে তা কলকাতাবাসী মাত্রই জানে। কাজেই খবরাখবরের হঠাৎ ধাক্কা লেগেই আছে। আমার স্বামী বলেছিলেন, 'তোমার মালতীদির লেটেস্ট খবরটি জানো কি?'

আমি তাঁকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি জানো নাকি?'

'ভদ্রমহিলার যা-ই বলো কোনো ইয়ে নেই।'

'ভদ্রমহিলার সমালোচনা থাক।' মালতীদির বিষয়ে কারো কাছ থেকেই কোনো মন্তব্য শুনতে আমি রাজি নই। নিজে অবিশ্যি এ নিয়ে অনেক কিছুই বলি, অনেক রাগারাগিও করেছি স্বামীর কাছে। বলেছি ও-রকম একটা নির্লজ্জ মানুষ আমি দেখিনি যাই বলো, তখন স্বামীই প্রতিবাদ করেছেন, 'নির্লজ্জ কী! ভালোবাসতে জানেন মহিলা।'

'ভালোবাসা না হাতি। বাজে। ওঁর এখন আসলে একজন পুরুষ মানুষের সাহায্য দরকার। জীবনটাকে তো হেলাফেলায় কাটিয়ে দিলেন, উদ্যোগ ক'রে যে একটা বিয়ে করবেন, আবার কারো দিকে তাকাবেন মন দিয়ে সেটুকু সাধ্যও তো নেই, ঐ এক রমেন নিয়েই ব'সে আছেন।'

কিন্তু নিজে বলি ব'লে অন্যে বলবে কেন? তা আমি সইবো কেমন ক'রে।

আমার স্বামী একটু হাসলেন, কেননা আমার প্রতিবাদের এই বদ-দোষটা তিনি জানেন। বললেন, 'রমেনের ডাক তো ওঁর কাছে নিশির ডাক। চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে দিব্যি আশ্রমে গিয়ে বসেছেন।'

'পুরোনো খবর। নতুন কিছু থাকলে দাও।'

'ওঁর বই বেরিয়েছে একখানা। উপন্যাস।'

'তাই নাকি?' উৎসাহিত হ'য়ে ফিরে তাকালাম, 'উপন্যাস লিখেছেন নাকি?'

'রিভিউ দেখলাম কাগজে, খুব প্রশংসা করেছে।'

'কোথায়? কোন কাগজে?' মালতীদি লেখেন তা-ই জানতাম। আগেও মাঝে-মাঝে এ কাগজে ও কাগজে দু' চারটা কবিতা বেরুতো তাঁর। বই বেরুনোটাও নতুন, উপন্যাসের খবরটাও নতুন।

স্বামী বললেন, 'খুব সম্ভব অমৃতবাজারে। বার লাইব্রেরিতে দেখলাম।'

'এনে দিয়ো তো।'

'কোনটা?' হাসলেন তিনি, 'বইখানা, কাগজখানা, না পুরো মানুষটাকে?'

'অতো ঠাট্টা করছ কেন?'

'আহা, ঠাট্টা কেন করবো। ভদ্রমহিলা শুনছি সাধনার কতো উচ্চ স্তরে বিচরণ করছেন এখন!'

'ভালোই তো।' গম্ভীর হ'য়ে অন্য দিকে তাকালাম। 'যে যে-ভাবে শান্তি পায় সেটাই তাঁর সাধনা। হয়তো তিনি এ-ভাবেই রমেনকে পাচ্ছেন।'

'আমি-ই কি তা অস্বীকার করছি।' ঈষৎ হেসে আমার স্বামী তাঁর মোটা পাইপে আগুন ধরালেন। প্রসঙ্গ সেখানেই শেষ হ'লো।

কিন্তু তা নয়। সুখ শান্তি যে-কোনো উপায়েই ধরা দেবে না তাঁর কাছে সেটুকু বোঝা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। হঠাৎ মালতীদির সঙ্গে আমার ট্রামে দেখা হ'য়ে গেল। খাটো চুলে রোল ক'রে, বেঁটে ছাতা হাতে নিয়ে, মস্ত ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি জানালা ঘেঁষে ব'সে আছেন। কী ভাবছিলেন কে জানে, প্রথম কয়েক মুহূর্ত পাশের মানুষটিকে অনুভব করতে পারলেন না। আমিও খেয়াল করিনি, তারপরেই মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মালতীদি!'

মালতীদি চকিত হ'য়ে তাকালেন, তারপর দুই চোখ ভরা উপচে-পড়া আনন্দ নিয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'এই যে তুই, কেমন আছিস রে?'

'তা দিয়ে আপনার কী দরকার?' অভিমান করলাম। আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে অবাক হলাম একটু। এত বছর পরে, এত বয়সেও মালতীদি কিন্তু ঠিক তেমনিই আছেন। তেমনি কাঁচা মুখ, তেমনি চুলের ডৌল, ব্যবহারের উষ্ণতা তেমনিই মনোহারী। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর চিহ্ন কই? বরং গোল-গোল দু'হাতে দুটি অত্যন্ত ভারি নতুন ঝকঝকে পাথর বসানো মকর-মুখ বালা। রীতিমতো দামি।

'দরকার নেই বুঝি?' হাসলেন তিনি। 'যেন তোরই কতো দরকার ছিলো।'

'ছিলো কি ছিলো না তার অনেক প্রমাণ দিয়েছি, তর্ক করবো না।'

'রাগ করিস না। বাচ্চারা কেমন আছে বল, অসিতবাবু কেমন আছেন।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'দেখছিস তো। তুই কিন্তু আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছিস। অনেক মোটা। খবর পেলাম বাড়ি বদলেছিস।'

'খবর-টবর তা হ'লে একটু পানও?' আমার আর অভিমান কাটে না।

'আমাকে ভাবিস কী? কলকাতা এসে পুরোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের মধ্যে একমাত্র যার কথা আমার সব সময় মনে পড়েছে সে তো তুই।'

'ঈশ।'

'খোঁজ নিয়েই তো জানলাম সে-বাড়িতে অন্য ভাড়াটে।'

খুশি হলাম। বললাম, 'কোথায় আছেন?'

'চল না, দেখে আসবি।'

'ঠিকানা দিন, ঠিক যাবো।'

'ঠিকানার দরকার নেই, আমার সঙ্গে চল।'

'এখন?'

'ক্ষতি কী?'

'আর-একদিন যাবো।'

'সে হয় না।'

আমার কোনো ওজর শুনলেন না সেদিন মালতীদি, জোরজার ক'রে ধ'রে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। কৌতূহল বা ইচ্ছে আমারও যে ছিলো না তা নয়, সঙ্গলোভও ছিলো বৈ কি। কাজেই হয়তো খুব জোরও করতে হ'লো না।

সেই টালিগঞ্জের শেষ প্রান্তে গঙ্গার ধারে জনমানবশূন্য নিরালা নির্জন কুটির একটি। সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিলো, আমাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে ঘরের তালা খুলে ভেতরে গিয়ে লণ্ঠন জ্বালালেন। চারদিকে তাকিয়ে আমার ভয় করছিলো। সেটা এখনকার টালিগঞ্জের গঙ্গার ধার নয়, সেখানে তখন সাপ খোপ শেয়াল সরীসৃপেরই বসবাস ছিলো বেশি। চারদিকের ঝোপাঝাড় জঙ্গলে তাকিয়ে মনে হ'লো কোনো ডাকাতদের গোপন আস্তানায় এসে পথ ভুল ক'রে দাঁড়িয়ে আছি।

মালতীদি বেরিয়ে এলেন, উঁচু ক'রে লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে বললেন, 'আয়।'

পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকলাম। এলোমেলো অগোছালো ঘর, মেঝেতে মাদুরের উপর একরাশি বইপত্র ছড়ানো ছিটোনো, সে-সব দু'হাতে সরিয়ে মালতীদি জায়গা করলেন একটু, তারপর বললেন, 'বোস।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'এখানে থাকেন?'

হাসলেন তিনি, 'খারাপ নাকি?'

'না, খারাপ আর কী।' আপনা থেকেই একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, মালতীদি মুখ নিচু করলেন। তাঁর নিচু-করা মাথার সিঁথিতে লণ্ঠনের

আলোর স্তিমিত রেখাটি জলজল ক'রে উঠলো, তাজ্জব হ'য়ে দেখলাম সিঁথিটি ঠিক অল্পবয়সের মতোই ঘন চুলের চাপে সরু আর সুদূর, আর সেই সরু আর সুদূর কুমারী সিঁথিটি সিঁদুরে রঙিন।

মুখ তুলে একটু হাসলেন, আস্তে বললেন, 'কী দেখছো ?'

'বিয়ে করেছেন ?'

'তা করেছি।'

'রমেন সেনকেই ?

'না।'

'কাকে ?'

'গোপালনগরের জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরীকে।'

'নরনারায়ণ চৌধুরীকে ?

'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই চুপ।

বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক উঠেছে, হাওয়ার শব্দ শাঁ-শাঁ করছে বড়ো-বড়ো গাছের মাথায়, শেয়াল হেঁকে উঠলো দুবার। মালতীদি বললেন, 'খুব অবাক হচ্ছো ?'

'তিনিও এখানেই থাকেন ?'

'না।'

'তবে ?'

'তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিজের বাড়িতে থাকেন।'

'স্ত্রীর সঙ্গে।'

'হ্যাঁ।'

আমি আবার চুপ।

অনেক পরে বললাম, 'আর আপনি এই ?'

'আমি এই ?'

'স্ত্রী আছে, তবুও আপনাকে বিয়ে করেছেন ?'

'একটু ভুল হয়েছিলো,' মুখখানা করুণ হ'য়ে উঠলো মালতীদির, চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'রমেন বলেছিলো—'

'এখানেও রমেন ?'

'এখানেও রমেন।' হাসলেন মালতীদি, 'আমার স্বামী রমেনেরই বন্ধু। রমেনের সূত্রেই এঁর সঙ্গে আমার আলাপ।'

'ও, বিয়েও তাহ'লে রমেনই দিলো ?'

'না, তা নয় ঠিক। আমরাই করলাম।'

গোপালনগরের এই জমিদারনন্দনটির অনেক খ্যাতিই শুনেছি, কিন্তু চরিত্রবান ব'লে কখনো শুনিনি। বললাম সে-কথা। আমার বলার সুরে হয়তো ঈষৎ ঝাঁঝ ছিলো। মালতীদি অস্থির হ'য়ে বললেন, 'না, না, মানুষ তো খারাপ নয়, খুব ভালো।'

না-ব'লে পারলুম না, 'তাই কি এক স্ত্রী থাকতে আরেকজনকে বিয়ে করেছেন ? আর বিয়ে ক'রে আপনাকে এই ভাবে রেখেছেন ?'

মালতীদি আকাশ পেলেন না, নীলচোখ ঘরের সিলিঙেই ভাসিয়ে দিলেন।

অনেক পরে ধীরে-ধীরে, ভাঁজে-ভাঁজে দ্রৌপদীর শাড়ির মতো উন্মোচিত করলেন তাঁর সব কথা।

বললেন, 'গিরিডিতে আমি যে-বাড়িতে ছিলুম, মনে আছে তোর ?'

'আছে।'

'আমার স্বামীরই বাড়ি সেটা।'

'আপনার স্বামীর ?'

হাসলেন তিনি। 'তখন অবিশ্যি স্বামী ছিলেন না, কখনো হ'তে পারেন এমন কল্পনাও ছিলো না। রমেন—'

'রমেনই সেই কল্পনার ক্ষেত্রটিকে উর্বর করলো বুঝি ?' আমি অধৈর্য হলাম।

মালতীদি শান্ত গলায় বললেন, 'রাগ করিস না, রমেনের দোষ নেই, রমেন কিছুই করেনি। কলকাতায় থাকতে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। সেই থেকে ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন, নানা ভাবে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করতেন, কাজে লাগবার চেষ্টা করতেন। বড়ো ঘরের ছেলে, আদবে কায়দায়, বিনয়ে, ভদ্রতায় দুরন্ত ছিলেন খুব। আমার ভালোই লাগতো।'

'ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি ?'

মালতীদি এই প্রশ্নের জবাবে উঠে গিয়ে কোণের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলেন, খানিক জল হাতে মুখে মাথায় বুলিয়ে নিয়ে ফিরে এসে মাদুরে বসতে-

বসতে বললেন, 'ভদ্রলোক বিবাহিত কি অবিবাহিত তখনো জানতুম না, আর তুই তো জানিস আমার খেয়াল কম, কৌতূহল কম, সে-বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাও আমার মনে আসেনি। শুনেছিলাম ধনী ব্যক্তি, সাজে পোষাকে, গাড়িতে জুতোতে তার প্রমাণও যথেষ্ট ছিলো। তোকে বলেছিলাম, এক ভদ্রলোক দেরাদুন যাচ্ছেন, তার সঙ্গে যাবো, মনে আছে?'

'সেই ভদ্রলোক?'

'তিনিই।' মালতীদি লণ্ঠনের আলোটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস নিলেন।

ঘরে, মেঝেতে পাতা ঐ একমাত্র মাদুরটি ছাড়া অন্য কোনো আসবাব ছিলো না। খাড়া হ'য়ে ব'সে থেকে আমি আড়মোড়া ভাঙলাম, এককাপ চায়ের তৃষ্ণা বোধ করলাম। আর তখনি আমার মনে হ'লো মালতীদি ফিরে এসে কিছু খেলেন না কেন? বললাম, 'আপনার রান্না করে কে?'

'কে আবার, যখন পারি নিজেই করি, নয়তো বাইরে-টাইরে কোথাও খেয়ে আসি।'

'কাজের লোক নেই?'

'না। এতো দূরে এখানে কেউ আসতে চায় না।'

'হাট-বাজারও তো বোধহয়—'

'অনেক দূরে। বিস্কুট খাবি? বিস্কুট আছে। চা যে দেবো তার উপায় নেই। স্টোভটা খারাপ হ'য়ে প'ড়ে আছে, তার উপরে কেরোসিন আনতে ভুলে গেছি। দেখছিস না, তেলের অভাবে লণ্ঠনটা কেমন নিভে-নিভে আসছে।'

আমার ভয় করলো। এমন একটা জন শূন্যজঙ্গলে আলো নিভে গেলে উপায় হবে কী? এখানে সাপ শেয়াল তো দূরের কথা, বাঘ থাকতেই বা বাধা কী। ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'ক-টা বাজলো?

'সাতটা হবে,' হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি, 'এটা এতো ছোটো আর চল্লিশের চোখ এতো খারাপ যে এ-ঘড়িটা আমার পক্ষে প্রায় আজকাল অব্যবহার্য হ'য়ে উঠেছে।'

মনে পড়লো ঘড়িটা মালতীকে ঢাকা থাকতেও পরতে দেখেছি, সেই শাঁখার মতোই লেগে থেকেছে হাতে। রমেনের উপহার। দামি জিনিশ।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'দেরাদুনে গিয়েছিলেন, সে-খবর আমি জানতাম। রমেন কী বললো?'

'ও যে কী ইরেস্‌পন্‌সেবল বলা যায় না। মালতীদি ঢোঁক গিললেন, 'ওর চিঠি না পেলে কি আমি যেতাম সেখানে? তুই বল? অথচ যখন গেলাম যেন আকাশ থেকে পড়লো।'

মালতীদির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একটা যন্ত্রণা দেখতে পেলাম। আগের মালতীদিকে মনে প'ড়ে আমারও যন্ত্রণা হ'লো। সামনে প'ড়ে-থাকা, আধভাঙা হাত-পাখাটা তুলে হাওয়া খেতে-খেতে বললাম, 'কী বললো?'

'কী আবার বলবে। আশ্রমে জায়গা দিতে পারলো না। গেরুয়া প'রে, সঙ্গে সুন্দরী শিষ্যা নিয়ে, খবর পেয়ে বাইরে এসে নির্বিকার মুখে বললো, "তুমি! কী আশ্চর্য, তুমি এলে কবে?"

যেন আমি বেড়াতে এসেছি। আর বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ দেখা করছি ওর সঙ্গে। রাগ ক'রে বললাম, "কবে আবার, এইমাত্র।" একগাল হেসে বললো, "হঠাৎ?"

"হঠাৎ! হঠাৎ কেন?" গলার স্বর হয়তো চ'ড়ে থাকবে আমার, বললাম, "তুমিই তো আসতে লিখেছ।"

"কী পাগল।" দয়ার অবতারের মতো বিগলিত মুখভঙ্গি ক'রে বললো, "তাই ব'লে এমন বিনা নোটিসে কেউ আসে?"

"তোমার কাছে আসতে হ'লে যে আজকাল নোটিস দিতে হয় সেটা আমার জানা ছিলো না।"

"আহা, তা কেন? এখানে আসা কি আর আমার কাছে আসা? আমি কে? এই আশ্রমের নিয়মকানুনের কথা বলছিলাম আমি। এখানে আসতে হ'লে একমাস আগে থেকেই জায়গা নেবার ব্যবস্থা করতে হয়, তারপর দীক্ষা নিয়ে ঢুকতে হয়।"

আমার চোখে জল এসে গেলো, বুকের মধ্যে যে কেমন করলো জানি না। রমেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি, ও চোখ নামিয়ে নরম গলায় বললো, "অবিশ্যি নরনারায়ণ যখন সঙ্গে আছে এতো ভাবনার কিছু নেই। বরং এসেছো, ভালোই হ'লো, দেখা হ'লো।"

আমি চুপ।

নরনারায়ণ আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, "কী হ'লো? আমাকে কি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে না নাকি?"

রমেনও হাসলো, "ও ঐরকমই। এতো নার্ভাস।"

বলাই বাহুল্য শেষ পর্যন্ত একটা হোটেলেই উঠতে হ'লো আমাকে। নরনারায়ণই নিয়ে এলো। অত্যন্ত উঁচুদরের হোটেল, চার্জ হৃদয়বিদারক। আরামের উপকরণও অবিশ্যি তার তুলনায় যথেষ্ট বৈ এক ফোঁটা কম নয়। মস্ত ঘরে মস্ত-মস্ত জানলা যেন সারা আকাশটাকে মুঠোয় ক'রে ভেতরে নিয়ে এসেছে। তাকালে ধূ ধূ পাহাড়ের সারি, ঘন সবুজ মখমলে মোড়া। জানলা ঘেঁষে নরম কৌচ, মেঝে জুড়ে নরম কার্পেট, খাট জুড়ে ডবল স্প্রিঙের উপর গদি। বেল বাজালেই পরিচারক এসে হাজির, চাইলেই চা; ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারে খাবারের স্বাদুতা আর প্রাচুর্য একটা মনে রাখার মতো ব্যাপার।

নরনারায়ণ বললো, "পছন্দ হয়েছে? বেশ কম্ফর্টেবল বোধ করছেন তো?" আমি আর কী বলবো, আমার রীতিমতো কান্না পাচ্ছিলো। দেরাদুনে আসবার টিকিট কাটতেই আমার দম ফুরিয়ে গেছে। সামান্য চাকরি করতাম, ছেড়ে ছুড়ে চ'লে গিয়েছিলাম। ধারণা ছিলো বাকি জীবনটা বুঝি ওখানেই নিরুপদ্রবে কেটে যাবে। রমেন আমাকে আশ্রম সম্বন্ধে সেই রকমই একটা অস্পষ্ট ছবি দিয়েছিলো। সামান্য যা পুঁজিপাটা সব খুইয়েই আমি রওনা হয়েছিলাম এমন কি ফ্ল্যাটটা পর্যন্ত ছেড়ে গিয়েছিলাম।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে নরনারায়ণ আবার বললো, "যদি বলেন তবে অবিশ্যি 'রেইনবো' তেও যাওয়া যায়। সে হোটেলটা এর চেয়েও ভালো, আর বাড়িটা একেবারে একটা টিলার উপরে, শহর থেকে দূরে।" আমি বললাম, "দেখুন, আমার সাধ্য খুব কম। তাই ভাবছিলাম এর চেয়ে কম দামি কোনো থাকবার ব্যবস্থা নেই এখানে?"

নরনারায়ণ জোরে হেসে উঠলো "ও, এখন তা হ'লে এটাই আপনার সবচেয়ে বড়ো চিন্তা?"

হাসি দেখে কী জানি কেন আমার হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। নরনারায়ণ হাসতে-হাসতেই বললো, "তা থাকবে না কেন? শুধু হোটেল নয়, ইচ্ছে করলে আপনি ধরমশালাতেই বা থাকতে পারবেন না কেন? সে তো বলতে গেলে ফ্রী।"

"তবে আমাকে তাই নিয়ে চলুন।"

আমার ব্যগ্র কণ্ঠস্বরে একটু চকিত হ'লো বোধ হয়। ঝকঝকে পালিশ গালে চুলে নখে জুতোয় একাকার মানুষটি এবার বৈষ্ণব ভঙ্গিতে নম্র হ'য়ে বললো, "আপাতত আপনি আমার অতিথি। যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করতে পারিনি, আমি জানি আমার আমার অযোগ্যতার কোনো তুলনা হয় না, আপনার মতো মানুষকে আমার মতো মানুষের আতিথ্য গ্রহণ করানোই প্রায় বাতুলতা, তবু বলি দয়া ক'রে সেই সম্মানটুকু অন্তত কয়েকদিনের জন্য দিন আমাকে।"

আমি তাঁর ভদ্রতায় মুগ্ধ হলাম, কিন্তু ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "তা কখনো হয়?"

"কেন হয় না?"

কেন হয় না সে-কথা বোঝাই কেমন ক'রে যদি না সে নিজে বোঝে। সেদিন অনেকটা সময় আমার ঘরে রইলো সে, বাক-বিতণ্ডা হ'লো খানিকক্ষণ, তারপর আমাকে শহর দেখাতে নিয়ে গেল। আমি পরের দিনই রমেনকে জানালাম সে-কথা। লিখলাম "কী করি বলো তো? আমার হাত শূন্য। কর্তব্যবোধ থেকে না দাও ধার হিশেবেই না-হয় খরচটা চালিয়ে দাও ক-দিন। তুমি তো মানুষ, একটা অতীত তো আছে?" সে জবাব দিল, "অনেক তো বয়েস হ'লো, আর কতো কাল এমন ছেলেমানুষ থাকবে? নরনারায়ণ আমার মোটেই পর নয়, অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু; তার কাছে এত বেশি লজ্জা না-করলেই সুখী হবো।"

আমি আবার লিখলাম, "তোমার বন্ধু তো আমার কী? আমি কেন হাত পেতে নেবো তাঁর কাছ থেকে? আর কিছু না পারো দয়া ক'রে ফেরবার টিকিটটা কেটে দাও, চ'লে যাই।"

চিঠি লেখালেখি যখন, তখন বুঝতেই পারছো আমাদের দেখাশোনা হচ্ছিলো না। রমেন ইচ্ছে করলেই সব সময় সকল মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পারতো না, সেটা নিয়ম ছিলো না তাদের আশ্রমের। এই চিঠি পেয়ে একদিন সে এসে হাজির। যেমন সকলের সঙ্গে দেখা করার নিয়ম ছিলো না, তেমনি আশ্রম থেকে স্বাধীনভাবে সব দিন গণ্ডির বাইরেও ওদের পা দেবার আইন ছিলো না। সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট ছিলো। সেদিন ছিলো সেই নির্দিষ্ট

তারিখ। এসেই আমার পাশে ব'সে পিঠে হাত রাখলো, "বাঃ, চমৎকার আছো তো। সুন্দর তো ঘরটি, নরনারায়ণের যত্নে তাহ'লে মন্দ নেই।"

রাগ ক'রে হাত সরিয়ে দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "এ-ভাবে কেন তুমি আমাকে অপদস্থ করলে? আমি তোমার কী করেছি? কেন তুমি আমার সঙ্গে বারে-বারে এই শত্রুতা করো?"

রমেন আমার অভিমান দেখে তার ধনুক-বাঁকা আশ্চর্য ঠোঁটে দারুণ হাসলো, চিরপরিচিত ভঙ্গিতে বেড-কভারের তলা থেকে বালিশ দুটো বার ক'রে নিয়ে বুকের মধ্যে দুমড়োতে-দুমড়োতে বললো, "লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না, এক কাপ চা খাওয়াও তোমার বেয়ারাকে ব'লে। আরো যদি কিছু খাওয়াতে পারো তাও দিয়ো।"

আমি বললাম, "এখানে আমিই খাই অন্যের পয়সায়। তোমাকে খাওয়াবো সে-শক্তি যদি থাকতো তা হ'লে সেটা নিজের জন্যেই খরচ করতুম।"

বললুম বটে, কিন্তু মন আমার নরম হ'য়ে এসেছে। দরজা-বন্ধ ঘরখানাতে একা তার অস্তিত্ব অনুভব করতে-করতে আমি কোথায় কতদূর চ'লে গিয়েছি। আমার সামনে কিছু নেই, সব পেছনে। সেই পেছনে ফেলে-আসা দিন-গুলো যেন মাখামাখি হ'য়ে উঠে এসেছে এই ঘরখানার মধ্যে। হাতের ঘড়ি দেখলো রমেন, অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, "সময়ের মেয়াদ আমার ভারি কম, রাগ ক'রে আর কী করবে। আমি যে নিতান্ত হৃদয়হীন তার পরিচয় তো তোমার অজানা নয়। আর কেন আমি এ-রকম, কেন কোনো বন্ধনই আমাকে বাঁধতে পারে না তাও আমি জানি না। সে জন্যেই সব ছেড়ে, ছুড়ে চ'লে এসেছি এখানে। তোমাকে তো বলেছি মালতী, আমাকে তুমি ভুলে যাও।"

মুখ ফিরিয়ে কেঁদে ফেললাম, "নিষ্ঠুর, ভুলতেই কি তুমি দাও আমাকে?"

রমেন চুপ ক'রে রইলো। অনেক পরে বললো, "দেবো।" হোটেলের অন্য স্যুইট থেকে ডেকে নিয়ে এলো নরনারায়ণকে, হাসিতে খুশিতে চঞ্চলতায় যেন বড়ো বেশি ছটফট করতে লাগলো, তারপর যে-কদিন আছি সে-কদিন শহর বেড়ানো থেকে আরম্ভ ক'রে রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার নরনারায়ণের উপর চাপিয়ে চ'লে গেল একটু পরে।

আর আমি তাকে দেখিনি। চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছি, চিঠি লিখে জবাব

না-পেয়ে অস্থির হয়েছি, ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেছি আশ্রমের দরজায়, কোনো ফল হয়নি।

দু' মাস ছিলাম। ভদ্রলোকের আদরে যত্নে মুগ্ধ না-হ'য়ে পারি নি। আস্তে-আস্তে রমেনের কথা চিন্তা করা ছাড়াও অন্য চিন্তা দেখা দিয়েছিলো মনে, রমেনকে ছাড়াও শেষের কয়েকটা দিন দেরাদুনে আনন্দেই কেটেছিলো। এই হ'লো সূত্রপাত। না, সূত্রপাত নয়, সূত্রবন্ধন।'

মালতীদি চুপ করলেন।

একটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভেসে এলো ঘরের মধ্যে, জানলা দিয়ে ঝুপ ক'রে একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়লো। আমি চমকে উঠেছিলাম, মালতীদি তাকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে আদর করতে-করতে বললেন, 'সব ডিটেলস্ শুনে আর কী করবি। ফিরে এলাম একসঙ্গেই, এসেই প্রথমে হাতের মকর-মুখ মোটা বালাজুটো আর গলার পাটিহারটা বিক্রি করলাম। হারটা অবিশ্যি আমার মার ছিলো, আর সোনাও ছিলো অনেক। যা টাকা পেলাম সবটাই দিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। বললাম, 'আপনার ঋণ শোধ করা আমার সাধ্য নয়, তবু—'

ভদ্রলোকের ফর্শা রংয়ে দুধের মধ্যে একফোঁটা আলতা গোলা হ'লো। ভারি গলায় বললেন, 'এভাবেই শেষে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দিলেন?'

ছি-ছি ক'রে উঠলাম, 'এ-সব কী বলছেন আপনি! ওখানে কি সোজা খরচ হয়েছে? এতে তো তার অর্ধেকও হ'লো না।'

ভদ্রলোক একটি কথা বললেন না, একটি বার তাকালেন না, নোটগুলো টেবিলের উপর উড়তে লাগলো ফড়ফড় ক'রে, তিনি সোজা বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। আমি একেবারে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমি যে-বাড়িতে এসে উঠেছিলাম, সেটা আমার পিসতুতো বড়দাদা ডক্টর চিদানন্দ দত্তের বাড়ি। বড়দা তখন লণ্ডনে বক্তৃতা দিতে গেছেন, তিনি বিপত্নীক, দুই ছেলে শিলং পাবলিক স্কুলে পড়াশুনো করে, বলতে গেলে তাঁর কলকাতার বাড়িটি বারো মাসই চাকর-বাকর নিয়ে খালি প'ড়ে থাকে। মাঝে-মাঝে আত্মীয় পরিজনরা এসে থেকে যায় দু'চার মাস। দেরাদুন থেকে ফিরে এসে আমারও ঐ বাড়ি ছাড়া ওঠবার অন্য জায়গা ছিলো না। ফ্ল্যাট

খুঁজছিলুম। খুঁজছিলুম মানে ঐ ভদ্রলোকই খুঁজে দিচ্ছিলেন। বই পড়তে পারা ছাড়া অন্য কোনো কাজই আমি বড়ো একটা গুছিয়ে করতে পারতুম না সে তো তুই জানিস। ঘরে-ঘরে বাড়ি দেখে ঠিকানা খুঁজে আবার বাড়িওলার সঙ্গে দেখা করা, দেখা ক'রে আবার পাঁচ টাকা ভাড়া কমানো, এ-সবের কথা ভাবলে আমার গায়ে জ্বর আসতো। আসল কথা কী জানিস, আমি মানুষটা ভারি অযোগ্য, ভারি অপটু।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালতীদি একটু চুপ করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতরটাতে যেন ঝিম ধরলো। সামনের মস্ত বট অশত্থের ঘন ডালের বাতাসে শকুন-বাচ্চা কেঁদে উঠলো একটা, জানলা কাঁপিয়ে শনশন বাতাস ব'য়ে গেল, মালতীদির চোখের পাতা কাঁপলো, হাতের আঙুল কাঁপলো, এমন কি কথা বলতে গিয়ে লালচে রংয়ের ঈষৎ ভারি, ছোটো, গোল, বাঁকা ঠোঁট দুটিও থরথর করলো দুবার। আমার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আস্তে বললেন, 'এর তিন মাস পরে আমার মনে হয়েছিলো এই বুঝি আমার সংসারধর্ম পালন করবার যোগ্য লোক এতোদিনে জুটেছে জীবনে।'

'রমেনকে ভুলে গেলেন?' বলে উঠলাম আমি। মালতীদি তাঁর সজল চোখ আমার চোখে মিলিয়ে বললেন, 'ভুলবো কেন? ভোলা কি যায়? সে চাপা পড়লো। আর তা ছাড়া তুই-ই বল, একটা সাধ কি হয় না? ইচ্ছে কি হয় না? আমি স্ত্রী হবার পক্ষে, মা হবার পক্ষে খুব অযোগ্য?'

মুহূর্তের বিরতি। শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল নিঃশব্দে মালতীদির বুকের কাপড়ে চুপসে গেলো। এর পরে আমার দিকে আবার তাকালেন তিনি 'আবার আমার ভুল হ'লো, মণি। ইনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই। ছেলেবেলায় বাপ-মায়েরা ধ'রে বিয়ে দিয়েছিলেন শখ ক'রে, প্রায় অবোধ বয়সে, আবার বাপ-মায়েরা মিলেই ঝগড়া-বিবাদ ক'রে তার উচ্ছেদ ক'রে দেন।'

আমি ব্যথিত হ'য়ে বলেছিলাম, 'আহা, তা হ'লে সেই মেয়েটির কী দশা হ'লো?'

'তাঁর দশার কথা ভেবে তোমাকে দুঃখ পেতে হবে না।' হাসলেন তিনি, 'তিনি বেশ সুখেই আছেন। আমি একটা দুর্বৃত্ত নই, বয়স হবার সঙ্গে-সঙ্গে

যে-মুহূর্তে বুঝেছিলাম পিতামাতার পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের জন্য একটি অপাপবিদ্ধা বালিকার সাফার করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেই মুহূর্তেই দেখা করেছিলাম তার সঙ্গে। ষোলো-সতেরো বছরের অপূর্ব সুন্দরী, নামত আমার স্ত্রী মহিলাটি তখন অন্য কোনো যুবকের সঙ্গে প্রেম করতে ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখেই ঠোঁট বাঁকিয়ে দরোয়ান ডেকেছিলেন। তারপরে সমস্ত স্ত্রী জাতটার উপরই আমার ঘেন্না ধ'রে যায়। কোনোদিন কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা ভাবতেও আমার রাগে মাথা জ'লে যেতো। আর সত্যি বলতে কী, দেখেছি তো অনেক, অনেক সুযোগও পেয়েছি, অনেকে কাছে এসেছে, এমন কি তুমি যতোই পাষণ্ড ভাবো না কেন, এই পাষণ্ডের জন্য দু' একজন মানুষ যে একেবারে অধীর না ছিলো তাও নয়। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' আমি আগ্রহ-ভরে তাকিয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে। তিনি নিবিড় হ'য়ে কাছে এসে মখমলের মতো নরম আর ভারি গলায় বললেন, 'কিন্তু তুমি ছাড়া আর কে আমাকে পাগল করবে জীবনে, এতো শক্তি আর কার আছে বলো?' আবার চুপ করলেন মালতীদি।

আমি বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কী! দেখতেই তো পাচ্ছিস। আমি বলেছিলাম একদিন চলো, তোমার বাড়ি-ঘর দেখে আসি।'

'বাড়িঘর যাচাই ক'রে স্বামী পছন্দ করবে?' বিদ্রূপ করলেন তিনি।

আমি বললুম, 'তা কেন, তোমার বাসস্থান, সে তো আমারও। আর দু'দিন বাদে যেখানে গিয়ে উঠবো, তার সঙ্গে একটা চাক্ষুষ পরিচয় হ'য়ে যাক না।'

কেমন একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে বললেন, 'সে-বাড়িতে আমি নিয়ে যাবো না তোমাকে।'

দ'মে গিয়ে বললাম 'কেন?'

'যতো সব বাজে আর অশিক্ষিত লোকের ভিড় সেখানে। ওখানে গেলে তো তুমি দম আটকে ম'রে যাবে।'

'আহা, আমিই যেন একটা অদ্ভুত কিছু। আমাকে ভাবো কী তুমি? দেখে নিয়ো তাদের সঙ্গেই আমার ব'নে যায় কিনা।'

'না, না, ওদের সঙ্গে আলাদা থাকবো।'

'তাতে বাড়িটা একদিন দেখে আসতে দোষ কী? পুরোনো বালিগঞ্জের লম্বা রাস্তা আলো-করা বাড়ি তোমাদের, আমার কতো দিন ওর কম্পাউণ্ডে ঢুকতে লোভ হ'য়েছে। কী গোলাপ ফোটে, বাইরে থেকে দেখা যায়।'

'শোনো মালতী,' গম্ভীর হলেন তিনি, 'আসলে আমাদের যে বিয়ে হচ্ছে, এটা আমি পাঁচকান জানাজানি করতে চাইনে।'

'কেন?' আমি অবাক হ'য়ে বললাম।

'সবই জানবে আস্তে আস্তে। এখন ও-সব থাক।'

'এখুনি বলো।'

'তুমি জেনে রাখো ও-বাড়ির সঙ্গে আমার কোনোই যোগ নেই। একা আছি তাই আছি। তোমাকে নিয়ে সেখানে আমি কোনোরকমেই বাস করতে পারবো না।'

'তোমার বাবা তো বেঁচে আছেন।'

'বাবার জন্যেই তো আরো অশান্তি। তাঁর জন্যেই আমি তোমাকে ও-বাড়িতে নিয়ে যাবো না।'

'কেন?'

'শুনলে তুমি খুশি হবে না।'

'তবু শুনি।' আমি জেদ করলাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে কী ভাবলেন, তারপর বললেন, 'বাবা নিজে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। অনেক দিন থেকেই তা-ই নিয়ে আমাদের মন-কষাকষি চলেছে। আমার মত না-নিয়ে কিছু করতেও পারছেন না, আবার ওদিকে নিজের জেদও ছাড়তে পারছেন না। বলবো কী, বাড়ির আবহাওয়াটা এখন আমার পক্ষে বিষতুল্য।'

এর পরে আমি আর বেশি কিছু বলতে পারি নি। চুপ ক'রেই ছিলাম। উনি হেসে বললেন, 'কী, মন-খারাপ হ'লো নাকি?'

'না, মন-খারাপ কেন?'

কাছে এসে পিঠে হাত রাখলেন, 'তোমারই বাড়ি, তোমারই ঘর, তোমারই সব, কেবল কয়েক দিন একটু চুপচাপ থাকা। বিয়েটা হ'য়ে গেলে তো আর উনি ফেলতে পারবেন না, কিন্তু বিয়ের আগে জানাজানি হ'লে মিছিমিছি হুলুস্থুল হবে একটা।'

আমি বললাম, 'তাই তো।'

উনি বললেন, 'তবে মুখ ভারি ক'রে আছো কেন?'

'কই, না তো।' বললাম বটে, কিন্তু মুখ ভারি হয়েছিলো কিনা জানি না, মনটা কেমন ভার হ'য়ে গেলো।

১০

'এর পরে একদিন খুব গোপনে' খুব নিঃশব্দে বিয়ে হ'য়ে গেল আমাদের। হিন্দুমতে হ'লো না; কেননা উনি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ। রেজিষ্ট্রি ক'রে হ'লো না, উনি বিবাহিত। নবদ্বীপে গিয়ে কণ্ঠীবদল হ'লো।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে শুনতে শুনতে এতোক্ষণে একটা প্রশ্ন করলাম আমি। আর মালতীদি সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত ক'রে আমার হাত চেপে ধরলেন 'তারপর? তারপর তুই আমার একটা উপকার করতে পারবি, মালা?

চমকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম 'কী?'

'তোর স্বামী তো একজন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার, একটা মামলা ক'রে দিবি?'

'কিসের মামলা?'

'চিটিংয়ের।'

'চিটিং!' আমি হতবাক।

দ্রুতগলায় মালতীদি ফিসফিস করলেন। এখন বলে কী জানিস্? আমাকে নাকি লোকটা কোনোদিন বিয়ে করেনি।'

'সে কী!'

'বলে আমিই নাকি চড়াও হ'য়ে কিছু টাকা খসাবার মৎলবে এ-সব ব'লে বেড়াচ্ছি।'

আমি স্তম্ভিত হ'লাম।

'তুই-ই বল, এ লজ্জা আমি রাখি কোথায়? এ-বেদনা আমি কেমন ক'রে সহ্য করি?'

আমি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম, 'এ-সব বলছে এখন?'

'যেমন আমার ভাগ্য।' মালতীদির চোখ জানালার ধূ ধূ অন্ধকারে কোথায় ভেসে গেল। 'বল তো, কী পাপ আমি করেছি যার জন্য সারাটা

জীবন ধ'রেই আমার এই শাস্তির পালা চলেছে, এই অপমান ভোগ করতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'কী আশ্চর্য! বিয়ে তো ভদ্রলোক নিজের গরজেই করলেন।'

'তা তো করলেনই।'

'তবে আবার কী হ'লো?'

'কী আবার।' অদ্ভুত ক'রে একটু হাসলেন মালতীদি 'স্ত্রীলোক তো ওর কাছে মাছির মতো।'

'ছি ছি!'

'টাকার বিনিময়ে বহু স্ত্রীলোকই ভোগ করেছে লোকটা, কেবল আমার উপর লোভ চরিতার্থ করবার জন্যেই ওর কণ্ঠীবদলের বিড়ম্বনা।'

'আর আপনি বিয়ে না-করা পর্যন্ত কিছুই বুঝলেন না?'

মালতীদি সজল চোখে হাসলেন, 'শুধু কি সেটুকুই বুঝিনি, আরো অনেক কিছুই তো বুঝিনি।'

'আর সব কী?'

'ওর স্ত্রী, ওর ছেলেমেয়ে, পরিবার, পরিজন—'

'আমি দুই চোখে বিস্মিত বেদনা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম মালতীদির দিকে। মালতীদি বললেন 'আসলে ওদের পুরোনো বালিগঞ্জের মস্ত বাড়িতে মস্ত পরিবার নিয়ে ও বাস করতো। সবই আমাকে মিথ্যে ক'রে বুঝিয়েছিলো। স্ত্রীর সঙ্গে জীবনেও ওর ছাড়াছাড়ি হয়নি। অপূর্ব সুন্দরী মহিলা, চার-চারটি ছেলেমেয়ে—'

'কী সাংঘাতিক!'

'স্ত্রী-ই সংসারের কর্ণধার। নরনারায়ণ রীতিমতো ভয় পায় স্ত্রীকে।'

'এতো সব আপনি আগে জানতে পারলেন না?' আমি যেন ধিক্কার দিলাম মালতীদিকে। মালতীদি নিশ্বাস চেপে বললেন 'পরেও হয়তো অজানাই থাকতো, মানুষ যে এতো মিথ্যে কথা বলতে পারে এটাই আমি জানতাম না। সকলকে বিশ্বাস করাই আমার স্বভাব। আর তার মধ্যে নরনারায়ণের মিথ্যে। আমার সাধ্য কি তাকে বুঝতে পারি। লোকটা একটা পাপের কুণ্ড। এই স্বাথ, জীবনী লিখছি একটা—' দেয়ালে ঠেলে-রাখা

ছোটো খোলা ট্রাঙ্কের ভাঙা ডালাটি উঁচু ক'রে রাশীকৃত কাগজ বার করলেন মালতীদি, 'এটা আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ চৌধুরীকেই উৎসর্গ করবো। উৎসর্গ করবো আমার স্বামী ব'লে।'

'স্বামী! ও লোকটাকে স্বামী বলতে আপনার ঘেন্না হবে না?'

'আর ঘেন্না! ঘেন্না তো স্বামী না হ'লেই। আমি তার সঙ্গে বাস করেছি না? স্বামী ব'লেই যে বাস করেছি সেটা তো জানবে লোকে? বাইরে এক ঝাঁক পাখি উড়ে স্থির হ'লো, আর এক প্রস্থ শেয়াল ডেকে উঠলো, আমি জানালায় তাকিয়ে বুঝলাম রাত বেড়েছে, একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'মালতীদি আমি এবার যাই।' মালতীদি আস্তে আমার হাতের উপর হাত রেখে বললেন, 'ভয় পেয়েছিস?' ভারি গলায় বললাম, 'না পাবার কী! কী ক'রে আপনি এখানে থাকেন?'

মালতীদির চোখ হাসিতে টলটল করলো, 'বোকা! তার চেয়ে তোর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো, "কী ক'রে আপনি এই বনবাসে এলেন।" মালতীদির হাসি দেখে আমার কান্না পেলো, বললাম, 'এসেছেন যে তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তার জন্য কতটা পথ হেঁটেছেন, কত পাহাড় ডিঙিয়েছেন, কত আগুন মাড়িয়েছেন, সাগর সাঁৎরেছেন, তা জেনে আর কী লাভ। কিন্তু মালতীদি, আপনি তো আর নিতান্ত 'বাংলার বধূটি' নন, আপনার গুণযোগ্যতার অভাব নেই, কী দুঃখে এমন না-খেয়ে না-প'রে ম'রে-বেঁচে এই জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন?'

'কী করবো?'

'কী আবার। আগে ছিলেন না? চাকরি করতে বাধা কী? অবিশ্যি আমি জানি না, চাকরি আপনি করছেন কিনা, কিন্তু ঘরবাড়ি খাওয়া-দাওয়ার যে দীনদশা আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে—'

'ঠিকই ধরেছিস, চাকরি আমি করি না।'

'কেন করেন না? একলা একটা মানুষ, কতটুকু লাগে আপনার? নিজেকে নিয়েই দিব্যি নিজে ঘর সাজাতে পারেন।'

মালতীদি তার একদিকের ভুরু বাঁকা ক'রে এমন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে আমি যেন একটা অবাক-করা কথা বলেছি যা তিনি পূর্বে কখনো শোনেন নি, এমনকি ভাবতেও পারেন নি। আমি বললাম, 'আর

চাকরিও আপনার এমন-কিছু ফ্যালনা হবে না, বড়ো কাজই পাবেন আপনি।'

'বলছিস কী তুই, মণি?' মালতীদি আকাশ থেকে পড়লেন, 'ওদের ঘরের বৌ হ'য়ে আমি চাকরি করবো? তা হ'লে কি সে আমাকে আস্ত রাখবে? চাকুরে মেয়ে ওর দু'চক্ষের বিষ। তাদের সে অসৎচরিত্র বলে।'

এবার আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'সে কী? ওর মতামতে আপনার কী এসে যায়? ওর সঙ্গে আপনার কিসের সম্বন্ধ?'

'হাজার হোক, আমার স্বামী তো।'

'স্বামী!' আমি তাজ্জব। মালতীদি বলছেন কী? দুঃখে দুঃখে কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেল? আমার দিকে তাকিয়ে বুঝলেন আমার মনের কথা, চোখ নামিয়ে যেন খানিকটা কৈফিয়ৎ দিলেন, 'তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি না। একদিন তো সুখেই রেখেছিলো। আর সত্যি বলতে আমাকে তাড়িয়েও দেয়নি, আমি নিজেই চ'লে এসেছি।'

আমি চুপ।

মালতীদি মাদুরের উপর আঙুল দিয়ে হিজিবিজি কাটলেন, 'সবই শুনেছিস যখন, গল্পের শেষটুকুও শোন।'

'শেষ তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'এটা তো উপসংহার। তার আগে আর-একটা পরিচ্ছেদ আছে।'

আমি কথা বললাম না। মালতীদি সংকোচে ভরা গলায় বললেন, 'কয়েকটা দিন, বুঝলি, ভালোই কেটেছিলো। একেবারে উল্লেখ না-করার মতো নয়। নিউ আলিপুরে মস্ত বাড়িতে ছিলুম, দাসদাসী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুরই অভাব ছিলো না। নরনারায়ণের প্রেমের অভাবও অনুভব করিনি কখনো। কেবল একটা জিনিস আমাকে পীড়া দিতো, সেটা হচ্ছে তার প্রণয়ের মধ্যে কোনো সুস্থতা ছিলো না, অপেক্ষা ছিলো না, মাঝে-মাঝে প্রায় বর্বর মনে হ'তো।'

'বিদ্বেষের কি তবে সেটাই কারণ?'

'না।'

'তবে?'

'সে কখনো রাত্রিবাস করতো না আমার সঙ্গে।'

'মানে?'

'মানে, দিনের বেলাটা থাকতো, রাত্তিরেও থাকতো কিছুক্ষণ পর্যন্ত, কিন্তু বারোটার ও-পিঠে নয়।'

'আর আপনি সারারাত একা বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যেতো?'

'জিজ্ঞেস করলে এক-একদিন এক-একরকম গল্প বানিয়ে বলতো।'

'আর আপনি তা-ই বিশ্বাস করতেন?'

'তাই বিশ্বাস করতুম। একজন বয়স্ক লোক অমন বানিয়ে কথা বলতে পারে সেটাই আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত ছিলো।'

'তাই ব'লে কোনো সন্দেহও হ'তো না?'

'প্রথম দিকে হ'তো না, কিন্তু শেষের দিকে তা নিয়ে কষ্ট পেয়েছি।'

'তারপর?'

'এদিকে আমাকে কিন্তু একেবারে কড়া নজরে রাখতো। লোকের সঙ্গে মেলামেশা, বেরুনো, বেড়ানো সব বন্ধ। কখনো-কখনো নিজে মোটরে চড়িয়ে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতেন, এই যা। হয়তো বা একদিন নিউ মার্কেট গেলুম, চিড়িয়াখানায় গেলুম, শহরের বাইরে দূরে চ'লে গেলুম কোথাও—'

'এই অত্যাচার আপনি সহ্য করতেন?'

'অত্যাচার কী? আমি তো বেরুতে কোনো দিনই ভালোবাসি না। আর বেরুবো কখন? সকাল থেকে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত সে তো নিজেই আছে সঙ্গে-সঙ্গে। তা ছাড়া সে-কথাটা আমি জানতুম না তখন।'

'তারপর?'

'বেশ কয়েক মাস এ-রকম অন্ধের মতোই কাটিয়ে দিলুম। হঠাৎ একদিন সকালে উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় এসে বললো, 'মালতী, কয়েকদিন ছুটি দিতে হবে আমাকে।'

আমি বললুম 'কোথায় যাবে?'

'মামলা বেধেছে বাড়ি নিয়ে, বাবার সঙ্গেও নানারকম গোলমাল চলেছে, ভয়ানক অশান্তিতে আছি। ম্যানেজারবাবুকে নিয়ে তাই একবার মহালে যেতে হচ্ছে।'

অস্থির হ'য়ে বললাম, 'ক'দিনের জন্য?'

'এই তো দু'চারদিন। মোটরে যাচ্ছি, পারলে দিনের মধ্যে একবার যে ক'রে হোক দেখা ক'রে যেতে চেষ্টা করবো।'

'কত দূর যাবে?'

'মাইল চল্লিশেক।'

'আমি একা থাকবো?'

'কী হবে? সব আমার বিশ্বস্ত লোক।'

'তার চেয়ে আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েই থাকি না?'

'পাগল!'

'কেন, পাগল কী, গেলে কী হয়?'

'বাবা আছেন না?'

'বাবা কিছু বলবেন না, আর বললেই বা আমি তা শুনবো কেন? আমার অধিকার নেই?'

'অধিকারের কথা নয় মালতী। এখন ভারি বিপদ। চারদিক থেকে শত্রুরা সব ছেঁকে ধরেছে। জমিদারির ব্যাপার তো জানো না।'

'যদি তা-ই হয় তাহ'লে আমাকেই বা একা এ-বাড়িতে রেখে যাবে কী ভরসায়? তার চেয়ে ওখানেই ভালো না? তোমাদের বিপদে নিজেকে নিয়ে এমন আলাদা হ'য়ে থাকতে আমার ভালো লাগছে না।'

'উপায় কী?'

'নিরুপায়েরই বা কী আছে?'

'বাবার সঙ্গে আমার যে-সব কথাবার্তা হয়েছে তার পরে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি না।'

'কী কথা হয়েছে?'

'শুনে লাভ নেই?'

'লাভ-লোকশানের কথাই ওঠে না। কী বলেছেন তিনি?'

'বলেছেন, আমি যে একটা জাতগোত্রপরিবার-পরিচয়হীন মেয়েকে বিয়ে করেছি তা তিনি জানেন।'

'ভালোই তো। সত্যি যে পরিচয়হীন নই গেলে তাও জানবেন।'

'সেটা জানবার জন্য তাঁর কোনো আগ্রহ নেই।'

'তাই ব'লে আমাকে এ-রকম আলাদা ক'রে রাখবে? তুমি থাকবে এক

বাড়িতে আর আমি অন্য বাড়িতে? কখনো কোনো স্বামী-স্ত্রী এ-রকম থাকে?'

'তারও ব্যবস্থা হবে।'

'কী ব্যবস্থা হবে?'

'বাবার সঙ্গে আমার সে-বিষয়েও কথা হয়েছে।'

'নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করাটা কি তোমার বাবার অনুমোদন-সাপেক্ষ?'

'কক্ষনো নয়। তাই যদি হবে তাহ'লে আর তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া কিসের?'

'বেশ তো, কী ঝগড়া করেছো বা কী ব্যবস্থা করেছো সেটাই শোনাও না।'

'বাবা আমাকে তোমার জন্য ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছেন তা জানো?' বলেছেন বিয়ে যদি করলেই তবে আমার পছন্দমতো মেয়েটিকে করলে না কেন?'

'তুমি কী জবাব দিলে?'

'জবাব দিলুম, তাঁর পছন্দের একটি নমুনা তো তিনি নিজেই দেখেছেন, এবার না-হয় আমার পছন্দটাই যাচাই ক'রে দেখুন একবার। চ'টে উঠলেন আমার কথা শুনে, জমিদারি মেজাজ ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। হুংকার দিয়ে বললেন—বেরিয়ে যাও সামনে থেকে। তক্ষুনি বেরিয়ে গেলুম সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমাকে ত্যাজ্য করবো।'

'তুমি রাজি হ'লে না, এই তো? ভাবছো গরিব হ'য়ে যাওয়ার চাইতে বিবাহিত স্ত্রীটিকেই বর্জন করা অনেক সহজ, না?'

'ঠাট্টা করছো?'

'ঠাট্টা করবো কেন? তার পরেও যে-রকম ঘটা ক'রে মহাল-পরিদর্শনে বেরুচ্ছো তাতে তো তাই মনে হয়।'

'না।'

'কী না?'

'আমাকে অত ছোটো ভেবো না।'

'এর মধ্যে আর ছোটো বড়োর কী আছে। আমার অভ্যেস তোমার মাত্র কয়েক মাসের, ধনরত্নের অভ্যেস তোমার জন্মগত।'

'অভ্যেসের প্রশ্ন নয়। মূল্যগত ভেদটাই বড়ো। কোটি টাকার বিনিময়েও কি আমি তোমাকে পাবো?'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, তাই। এটা তুমি জেনে রাখো, আমি যা-ই করি তোমার ভালোর জন্যই করছি। আমি জানি, আমার বাবা রাঘবেন্দ্রনারায়ণ একদিন নিজেই এসে সেধে নিয়ে যাবেন তোমাকে।'

'সে-দিন কবে ?'

'খুব সুদূর নয়। বৃদ্ধ বাপ, আমি ছাড়া কেউ নেই তাই তাঁর, এইটুকু অন্যায় আমি সহ্য ক'রে নিয়েছি ; আর তাঁর জন্য তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছি। যদি সেটাকে তুমি আমার কাপুরুষতা ব'লে মনে করো, তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই—'

লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'না, না, তা নয়। বাবার উপর নিশ্চয়ই তোমার কর্তব্য আছে, একটু অপেক্ষা করলেই যদি সব গোল মিটে যায় তবে তা-ই ভালো।'

নরনারায়ণ খুশি হ'লো এ-কথায়, আদর করলো আমাকে, তারপর বিদায় নিল।

এখানে থামলেন মালতীদি। তাঁর ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো একবার। কী বলতে গিয়ে বলতে না-পেরে চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। আমি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জোরে-জোরে হাতপাখাটা নাড়তে লাগলাম। সহসা অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা নামলো ঘরের মধ্যে। কতকাতা শহরে বাস ক'রে বহু বছর সে-রকম শব্দহীনতার সঙ্গে পরিচয় নেই। যেন দম আটকে এলো। একটু পরে চোখ তুললেন মালতীদি, চোঁক গিলে বললেন 'বুঝলি, সেই যে ফাঁকি দিয়ে গেলো আর তার খোঁজ নেই।'

'ফাঁকি !'

'সব ফাঁকি। সব তার ফাঁকি। সেই ফাঁকি ধরতে আরো অনেক সময় কেটে গিয়েছিলো আমার। শেষে আস্তে-আস্তে মেঘ জমলো মনে। সন্দেহের বীজ চারদিকে অঙ্কুর মেললো।'

'তারপর ?'

'তারপর একদিন সকালে দোতলার সোনার খাঁচা ছেড়ে নামলাম একতলায়, একতলা থেকে লনে, লন পেরিয়ে দরোয়ানের নিষেধ, শাসন, বাধা বিপত্তি সব এড়িয়ে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরলাম। নিউ আলিপুরে রাস্তাটি সুন্দর। এই রাস্তার বুক বেয়ে আরো কতবার কত জায়গায় গিয়েছি

নরনারায়ণের সঙ্গে, তার মস্ত গাড়ির গহ্বরে কত কিছুর স্মৃতিই সঞ্চিত হয়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু সেদিন সকালের মতো একদিনও লাগেনি। কালো পীচ-ঢালা প্রশস্ত রাস্তাটির উপর আর যেন কোনোদিন প্রথম সূর্যের নরম আলো অমন আলস্যে বিছিয়ে থাকতে দেখিনি। দু' পাশে বড়ো-বড়ো গাছ, গাছের ছায়ারা সুখী প্রতিবেশীর মতো এ ওর গলায়-গলায়। আলো-ছায়ার বুনোট পাটি। নির্জন রাস্তায় হু-হু ক'রে গাড়ি চলছিলো, হাওয়ার ঝাপট লাগছিলো মুখে, মা-র কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে প'ড়ে গেল দেশের কথা, সুবর্ণকোটি নদীর কথা। এ-রকম সময়ে সেই নদীতে জল কম থাকতো, আমরা ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা হাঁটুজলে নেমে স্নান করতাম, লাল গামছা দিয়ে মাছ ধরতাম। দারুণ হাওয়া বইতো সেখানে। ডুবিয়ে-ডুবিয়ে যখন চোখ লাল হ'য়ে যেতো, মা এসে জোর ক'রে তুলে বকতে-বকতে বাড়ি নিয়ে যেতেন। কোথায় সে-সব দিন ? কত দূরে ফেলে এলাম ? এই গাড়িটা যেমন ক'রে সব পেছনে ফেলে আমাকে নিয়ে আজ এগিয়ে চলেছে, ঠিক তেমনি ক'রেই মনের চাকায় ইস্টিম দিয়ে ভগবান আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এর পরে আরো কতদূরে নিয়ে যাবেন তাই বা কে জানে। মাটির কাঁচা ঘরে শীতের ঠাণ্ডায় মেঝের উপর হোগলা বিছিয়ে, সেই হোগলার উপর কাঁথা পেতে শুয়ে মা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন। নাড়ি কাটতে-কাটতে হাতে নখে একরাশ ময়লা নিয়ে রাক্ষসীর মতো সর্দি দাই দাঁত মুখ সিঁটকিয়ে বলেছিলো—ইঃ, মেয়ে! মা হাসিমুখে বলেছিলেন, এই আমার সাতরাজার ধন এক মানিক। বেশি বয়সে সন্তান হয়েছিলো তাঁর। আমিই তাঁর প্রথম সন্তান। সেই আঁতুড় ঘরের মানিক আমি। আমিই একদিন সাগরপারের মানিক হ'তে গিয়েছিলাম। কোথায় দশ বছর বয়সে বিয়ে হ'য়ে, নাকে নোলক প'রে, কানে মাকড়ি দিয়ে, দশহাত চেলি কাপড়ে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে, কাঁদতে-কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি যাবো—তা নয়, পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ ক'রে গেলাম ইশকুলে। ইশকুল থেকে কলেজে। একটা ডোবা থেকে মহাসমুদ্রের বিস্তার। ঠাকুমা রেগে গিয়ে বাবাকে বলেছিলেন, তোর মেয়ের এই লেখাপড়া রোগই একদিন কাল হবে। বাবা একগাল হেসে বলেছিলেন কোনো-কোনো মানুষ তো কালকে ডিঙোতেই সংসারে জন্ম নেয়। এই রকম ক'রে বানর থেকে মানুষ হয়েছি, মানুষের বুদ্ধি হয়েছে, চেহারায় আবার ফুটেও উঠেছে সেই আলো।'

সেই কালকেই আমি ডিঙিয়েছি এতোকাল, তারপর এসেছি এখানে, যেখানে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরলে সব ধূ ধূ। সত্য শুধু নরনারায়ণের বিশ্বাস-ঘাতকতার যন্ত্রণা।

যখন গাড়ি এসে স্টোর রোডে থামলো, নেমে দাঁড়িয়ে ভালো ক'রে দেখে নিলাম নেম-প্লেটটা। তারপর টিপে-টিপে পা বাড়ালাম। বুকের ভেতরটা কিন্তু ঢিপঢিপ করছিলো। মনে হ'লো ফিরে যাই, তারপর যার বাড়ি তার সঙ্গেই আসবো একদিন। মনেই হ'লো, কিন্তু থামলাম না। ট্যাক্সিটাকে বাইরে অপেক্ষা করতে ব'লে ফটক খুলে ভেতরে ঢুকলাম। বিশাল বাড়ি, চারপাশে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে ভয় করলো এ-বাড়ি আমার। আমি আমার আপন অধিকারেই এ-বাড়ির মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছি। এ-বাড়ির সারা অন্তর আমারই জন্য অপেক্ষা করছে এতোকাল ধ'রে। একেবারে নিস্তব্ধ পুরী, একটি লোক দেখতে পেলুম না আশে-পাশে, যাকে অবলম্বন ক'রে সাহস পাই একটু। ভাবলুম, যদি নরনারায়ণ না থাকে তা হ'লে কী করবো? ফিরে আসবো? না পরিচয় দেবো? যদি নরনারায়ণের বাবা রাজা-বাহাদুরের মুখোমুখি প'ড়ে যাই, কী বলবেন তিনি আমাকে? তাড়িয়ে দেবেন? না সাদরে গ্রহণ করবেন কন্যাস্নেহে? বাগানে নানারঙের ফুল ফুটেছে, রোদ কাঁপছে মাথায়-মাথায়, প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, ধীরে-ধীরে অর্ধচন্দ্রাকার ঘাস-মোড়া সবুজ মখমলের মতো নরম রাস্তা প্রত্যেক পদক্ষেপে অনুভব করতে-করতে এক সময়ে এসে বারান্দায় উঠলাম। একটা লোক ঝাড়পোঁছ করছিলো, অবাক হ'য়ে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'কাকে চান?'

আমি যে এ-বাড়ির মালিক সেই অহমিকাটুকু অচেতনভাবেই মনের মধ্যে বহন করছিলাম, বোধ হয় তাই জবাব না-দিয়ে গম্ভীর গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কী কাজ করো এখানে?'

'আজ্ঞে আমি বেয়ারাদের হেড। আমি উদয়।'

বুঝলাম বিখ্যাত লোক। বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকবার বিরাট দরজাটি অতিক্রম করলাম পর্দা সরিয়ে। লোকটিও পেছনে-পেছনে এলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কুমার বাহাদুর কি মহাল থেকে ফিরেছেন?'

'মহাল?' লোকটি ভুরু কুঁচকোলো, 'মহালে তো যাননি?'

'যাননি? যাবার কথা ছিলো যে।'

'দাদাবাবু কেন মহালে যাবেন। সেজন্যে তো ম্যানেজারবাবুই আছেন।'

নিশ্বাসটা বড়ো হ'লো আমার। একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'তা হ'লে উনি বাড়িতেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ঘরে থাকেন উনি? আমাকে নিয়ে যেতে পারবে সেখানে।'

'উনি যে এখনো অন্দর থেকে নামেননি। ঘুমুচ্ছেন।'

'ঘুমুচ্ছেন? বেলা দশটায় তাঁর ঘুম?'

'রাত জাগতে হয় কিনা? তাছাড়া দাদাবাবুর ঘুমই অমনি।'

'রাত জাগেন কেন?'

'ও মা, বৌরানীর যে খুব অসুখ। বাঁচবার আশাই ছিলো না। কদিন ধ'রে কত ডাক্তার, কত—

'বৌরানী? বৌরানী কে?

'আমাদের বৌরানী। দাদাবাবুর ইস্তিরি। তিনি যে এ-যাত্রা বেঁচে উঠেছেন, সে আমাদের কতো ভাগ্যি।'

'দাদাবাবুর বৌ! তিনি এখানে? এ-বাড়িতে?'

'তবে আর তেনি কোথায় থাকবেন? তেনি না-থাকলে কি একদিন চলে? বুড়ো কর্তা তো বলতে গেলে বৌরানীর হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছেন, আর ছেলেমেয়েরাও বড়ো হ'য়ে উঠেছে—' লোকটি বেশ জাঁকিয়ে গল্প ফাঁদতে বসেছিলো, আমি ব'সে পড়লাম সামনের লম্বা সোফাটায়, শূন্য দৃষ্টিতে কোন দেয়ালে যে তাকিয়ে রইলাম কে জানে। 'আরেকটি হ'তেই এই অবস্থা, লোকটি তার অসমাপ্ত বাক্য সাঙ্গ করলো, 'তা ছেলেও হ'য়েছে তেমনি। একেবারে রাজপুত্তুরের মতো।'

পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে একমাথা পাকা চুল, নিকেলের চশমা পরা ফতুয়া গায়ে এক বৃদ্ধ মুখ বার করলো। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে চাই?'

আমার গলায় শব্দ ছিলো না। আমার চোখে সমস্ত জগৎটা চকির মতো ঘুরছিলো। উদয় বললো, 'দাদাবাবুকে চাইছেন। বলছি, দাদাবাবুর এখনো ঘুম ভাঙেনি।

'কী দরকার?'

বৃদ্ধটির প্রশ্নের ধরন যতো কর্কশ, চোখের দৃষ্টি তত তীক্ষ্ণ। যেন অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে নিতে চায়। হঠাৎ আমার ভেতরকার আহত সাপটা কোমর সোজা ক'রে উঠে দাঁড়ালো। আমি যে কে সেই চেতনাটাই যেন গ'র্জে বললো, 'সেটা তো আপনাকে জানাবার বিষয় নয়। তা হ'লে আমি আপনার কাছেই আসতাম। আমি এসেছি আমার স্বামীর কাছে। আপনি দয়া ক'রে এ-খবরটা তাঁকে পৌঁছে দিলে বাধিত হবো।'

'কী!'

'আমি কুমার বাহাদুরের স্ত্রী মালতী দেবী চৌধুরানী।'

'স্ত্রী!' বৃদ্ধের পাকা মাথা ন'ড়ে গেলো। উদয়ের ছোটো চোখ আরো ছোটো হ'লো। এক পলকে ওরা তাকিয়েছিলো আমার মুখের দিকে। ভেবে পাচ্ছিলো না এর পরে কী করবে, কী বলবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে স্বয়ং কুমার বাহাদুর নিজেই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ঘরে এসে ঢুকলো। তার বেশভূষা দেখে বোঝা গেল সোজা বিছানা থেকেই উঠে এসেছে, পরনে রাত-কাপড় ছিলো। চোখে মুখে ঘুমের কাতরতা ছিলো। কোনো দিকে লক্ষ্য ছিলো না তার। বোধহয় অসুস্থ মানুষটির জন্য কোনো জরুরি তাগিদেই তাকে নেমে আসতে হয়েছে। অস্থির পায়ে ঘরে ঢুকে বিরক্ত গলায় বললো, 'এই যে সরকার মশাই, শুনুন আপনি গাড়িটা নিয়ে একবার বাথগেটে চ'লে যান্ তো এই ইনজেকশনটা চাই।' প্রেসক্রপশনের কাগজটি এগিয়ে ধরলো সে, 'যদি সেখানে না পান স্যর মেডিকেল স্টোর্সে যাবেন। যদি সেখানেও না পান তা হ'লে সোজা—' অনেকক্ষণ সহ্য করেছি, আর পারলাম না। প্রায় লাফিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। বিকৃত স্বরে বললাম 'মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, তুমি এই?'

ঘৃণায় লজ্জায় দুঃখে আমার গলা আটকে আসছিলো। চমকে উঠে দু'হাত পেছিয়ে গেলো সে, গোল আর শাদা মুখটা কেমন বোকা-বোকা দেখালো, দু'পাশে দুটো মাংসল হাত তার ঝুলে পড়লো। আমি সেই হাত দুটো ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম 'তুমি এতো জঘন্য? এতো নিকৃষ্ট?'

মুহূর্তে সে সামলে নিল নিজেকে, গালের দুধ-ধোয়া সুখী রং লাল দেখালো, আমি যে তার নিষেধ শাসন না-মেনে, চারদিকের আঁটঘাঁট সেপাই সান্ত্রী ডিঙিয়ে এমন ঘরকুনো আর বোকা স্বভাব নিয়ে সোজা এ-বাড়িতে চ'লে

আসবো এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। সরকার মশায়ের দিকে তাকিয়ে বললো কী, জানিস? 'এই স্ত্রীলোকটি কে, সরকার মশাই?' আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতো বড়ো মিথ্যেটা অনায়াসে উচ্চারণ করলো সে। আর তখন আমার কী ইচ্ছে করলো? ইচ্ছে করলো একটা চীৎকার দিয়ে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে ফেলি। ঐ মস্ত বড়ো বাড়িটার দেয়াল চৌকাঠ খানখান হ'য়ে ভেঙে যাক সেই চীৎকারের চাপে। কিন্তু গলার স্বর ফুটলো না। সরকার মশাই মাথা চুলকে বললেন, 'আজ্ঞে ইনি তো বলছেন—'

'ইনি কী বলছেন শুনতে চাই না। আপনারা যাকে-তাকে ফটক দিয়ে ঢুকতে দেন কেন, সেটাই জানতে চাই আমি। যতো সব পাগলের কাণ্ড—'

'তুমি আমাকে চেনো না? চেনো না? কাপুরুষ, হীন, নীচ, মিথ্যুক—' প্রাণপণ শক্তিতে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, কিন্তু ততক্ষণে সে ভেতরে চ'লে গেছে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে এখানে কেঁদে ফেললেন মালতীদি, আর আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেন দাঁতে দাঁত লেগে গেলো। উত্তেজনায় হাতে হাত আঁকড়ে রুদ্ধস্বরে বললুম 'আপনি তাকে খুন করতে পারলেন না? আপনার পায়ে জুতো ছিলো না? পাপিষ্ঠ! লম্পট! এর সাজা কী ও পাবে না মনে করছেন? পাবে। পাবে।'

'আর সাজা। ভগবান যে কার পাপে কাকে সাজা দেন সে-কথা শুধু তিনিই জানেন।' জলভরা চোখে মুখ তুলে তাকালেন মালতীদি।

'আপনি তারপর কী করলেন?'

'কী আর করবো? ট্যাক্সিটা ভাড়া না-পেয়ে দাঁড়িয়েছিলো, কখন এসে আবার সেটাতেই চেপে বসলুম।'

'চুপচাপ ফিরে এলেন?'

'চুপচাপ ফিরে এলাম।'

'কেন এলেন?'

'কী করতে পারতাম?'

'কী পারতেন না? ওকে দাঁতে, নখে ছিঁড়ে ফেলতে পারতেন। যেতে পারতেন ওর বাপের কাছে। চীৎকার ক'রে জড়ো করতে পারতেন আমলা ফয়লা চাকর-বাকর সব গুষ্টিকে। ওর মুমূর্ষু স্ত্রীকে জানাতে পারতেন তার স্বামীর কীর্তি।'

'পারিনি। পারিনি। কিছুই পারিনি, মণি। আমি কিছুই পারি না। জীবনে কারো সঙ্গে কখনো গলা তুলে একটা তর্কও করতে পারিনি কোনো-দিন। রাগ হ'লে, দুঃখ হ'লে শুধু চুপ ক'রে জ্ব'লে-পুড়ে মরেছি তবু কাউকে বলতে পারিনি কিছু। আমি এই রকমই। এই আমার স্বভাব। আমার দুর্বলতা।'

'কোনোদিন পারেননি ব'লে সেদিনও পারলেন না? সব অপমান নিঃশব্দে স'য়ে ফিরে এলেন?'

'সইতেই হ'লো। সে-ই যখন আমাকে স্বীকার করলো না, তখন আর—'

'স্বীকার করা না-করার কথা নয়, আপনি যে কে, আপনার কথা যে সত্য সেটা তো প্রমাণ হ'তো! আর ঐ ভদ্রমহিলা, যার অসুখে বুক ফেটে যাচ্ছে লোকটার, সে তো সব জেনে ঘৃণা করতে পারতো তার স্বামীকে!'

'ভদ্রমহিলার কী দোষ?'

'দোষগুণের কথা নয়। ভদ্রমহিলার জানা উচিত কী ভুলের মধ্যে সে বাস করছে। কী তার স্বামী!'

'ভুল তো ভালোই। ভুলের মধ্যেই তো আমরা সারা জীবন বেঁচে থাকি। ভুল না-থাকলে আর রইলো কী। এই ধর না আমিও যদি সেদিন না যেতুম ওখানে, অবিশ্বাস না-করতুম, নিজের ভুল নিয়ে নিজে মুগ্ধ হ'য়ে বেশ তো সুখেই থাকতে পারতুম। ভুলটা ভাঙলো ব'লেই তো এতো কষ্ট।' মালতীদি উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে দু'চাপড়া জল দিয়ে এলেন মাথায়, আঁচল দিয়ে মুছতে-মুছতে বললেন 'আজকাল হয়েছে কী জানিস, মাথাটা কেমন গরম হ'য়ে ওঠে থেকে-থেকে। যেন কেমন ক'রে ওঠে।'

'মাথার আর দোষ কী?'

'তাই তো।' মালতীদি হাসলেন। আমার হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে বললেন, 'হাওয়াটা কেমন বন্ধ হ'য়ে গেল, না রে?'

আমি ঈষৎ অবাক হ'য়ে বাইরে বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দ শুনতে-শুনতে বললাম, 'কই, না তো? আজ তো খুব হাওয়া।'

'তাই নাকি? ঐ ছাখ আবার আমার সে-রকম হ'লো।'

'কী রকম?'

'মনে হচ্ছে নিশ্বাস নেবার মতো হাওয়াটুকুও যেন নেই পৃথিবীতে।'

'এতো গরম লাগছে আপনার?'

'সেদিন ট্যাক্সিতে ব'সে ফিরে আসতে-আসতেই প্রথম এ-রকমটা হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো শরীরটা যেন একটা অসীম শূন্যতার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, কোথাও নিশ্বাস ফেলার মতো এতোটুকু অবলম্বন নেই। ভেবে-ছিলাম গাড়ির মধ্যেই বুঝি দম আটকে ম'রে প'ড়ে থাকবো। কিন্তু আস্তে-আস্তে নিজে থেকেই কেটে গেলো সেই ঘোর। পরে অবিশ্যি নরনারায়ণ ডাক্তার দেখিয়েছিলো।'

'নরনারায়ণ? তারপরেও নরনারায়ণের সঙ্গে ছিলেন আপনি?'

মালতীদি চোখ নিচু করলেন। আমার হাতটা নিজের মুঠোয় টেনে নিয়ে ভেজা গলায় বললেন, 'বাড়ি এসে গুছিয়ে নিয়েছিলুম সব। ভেবেছিলুম এ-বাড়িতে থাকার গ্লানির চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো। কিন্তু সে যে পিছনে-পিছনে এসে হাজির। বলে, ক্ষমা করো!'

'উঃ, কী নির্লজ্জ।'

'কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধ'রে—'

'ছি ছি!'

'বললো, তুমি চ'লে গেলে আত্মহত্যা করবো।'

'আত্মহত্যা! ও করবে আত্মহত্যা! ঘরে-ঘরে তবে সর্বনাশ করবে কে? স্কাউণ্ড্রেল। লম্পট। কিন্তু মালতীদি, আপনি কী। আপনার দেহে কি রক্ত নেই, মাংস নেই? মান-সম্মানবোধ কী আপনার এতোই বোবা?'

'রাগ করছিস?'

'করবো না? আমি আপনার মতো নই। আমার এ-সব শুনতেও অসহ্য বোধ হচ্ছে!'

'আমারই কি হয় না? কত যে হয় কাকে বলি?'

'তার কী প্রমাণ আপনি দিয়েছেন? আপনার চেহারায় তার কতটুকু চিহ্ন আছে?'

'আছে রে, আছে। নিজেকে শাস্তি দিতে কি আমি কম দিই?'

'নিজেকে! নিজেকে কেন? শাস্তি দেবেন তাকে। সেই পাষণ্ডটাকে। যে আজ আপনাকে এই সর্বনাশের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। সে আত্মহত্যা করলে আপনার কী হ'তো? পৃথিবীর পাপ কমতো একটা।'

'জানি। সব জানি। তবু যে কেন লোকটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারি না মন থেকে কে জানে। এক মিথ্যা ঢাকতে সেদিন নরনারায়ণ যখন আরো শত শত মিথ্যার জাল বিস্তার করলো আমার কাছে, আমি বুঝে-সুঝেও মূর্খ পাখির মতো আবার ধরা দিলাম সেই জালে। ও বললো, ওদের বাড়ির লোকেরা যদি সেদিন আমাকে চিনতে পারতো তাহ'লে বিষ খাওয়াতো আর সেই ভয়েই ও চেনে না ব'লে স'রে গিয়েছিলো। আমি বিশ্বাস করিনি সে-কথা, কিন্তু তবু কী জানি কিসের মোহে মেনে নিয়েছিলুম। ওর স্ত্রী ঐশ্রিলা দেবী সম্বন্ধে ওদের বেয়ারা আমাকে যে সব খবর দিয়েছিলো তা-ও যে সব মিথ্যে, এ-কথাটাও নরনারায়ণের মুখ থেকে আমি ধৈর্য ধ'রে শুনেছিলুম। তুই বলবি কী, মণি, সে-সব কথা ভাবলে নিজের উপরে আমার নিজেরই ঘেন্না ধ'রে যায়।'

'বলেছিলুম, যদি বিষ খাওয়ায় খাওয়াক, কিন্তু এ-ভাবে এ বাড়িতে আর আমি আলাদা বাস করবো না। যদি সসম্মানে তোমার পৈতৃক বাড়িতে নিয়ে তুলতে পারো তবে চলো, নয়তো এই শেষ।' বললো, কেন, এটাও কি আমার বাড়ি নয়। আমি বললাম নিশ্চয়ই তোমার বাড়ি, তবে বাগান-বাড়ি। যেখানে তোমাদের মতো জমিদারপুত্ররা তাদের স্ত্রীলোক রাখে। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী।'

'কী জবাব দিলেন আপনার স্বামী?'

'জবাব দিলেন, তা-ই হবে। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষাই করেছিলুম, মণি, কিন্তু তাও তার মিথ্যা, ঠিকানা বুঝতে পারলাম সে-অপেক্ষার কোনোদিন শেষ হবে না। তারপর চ'লে এলাম একদিন।'

'আর এসেও তার নামই জপ করছেন। এখনো ভাবছেন তার অনুমতি ছাড়া আপনার এক পা-ও নড়া উচিত নয়। ছি! আপনার লজ্জা হওয়া উচিত, মালতীদি।'

'ধিক্কার তুই একশোবার দিতে পারিস। কিন্তু, মণি, হৃদয় যে বড়ো অবুঝ। ভালো হোক, মন্দ হোক, একবার নিজেকে সমর্পণ করলে আর কোনো উপায় থাকে না। আর মুক্তি মেলে না তা থেকে। আমি যে লোকটাকে ভালোবাসি।'

'ভালোবাসেন! ঐ লোকটাকে!' আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম কথা শুনে। হায় রে অবোধ ভালোবাসা।

অবশ্যি ভালোবাসার এই রূপ মালতীদির নতুন নয়। এই সর্বনাশা ভালোবাসার সুযোগ রমেনও কম নেয়নি তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু তবু তাতে প্রলেপ ছিলো, সবটাই শুধু ফাঁকি ছিলো না, রমেন আর যাই হোক, যতক্ষণ ভালোবাসতো ততক্ষণ মনেপ্রাণেই একনিষ্ঠ থাকতো তার প্রণয়িণীর প্রতি। তারপর যেদিন মন বদলাতো, ছেড়ে-ছুড়ে চ'লে যেতো দূরে। প্রবঞ্চনা দিয়ে দেহ ভোগ করতো না। অসৎ ছিলো না সে। শরীরের ক্ষুধা সে মনের ক্ষুধাকে বাদ দিয়ে ভাবতো না। কিন্তু নরনারায়ণ। ছি!

আমি মালতীদির দিকে একপলকে তাকিয়ে রইলুম। সুন্দর, সরল একখানা পবিত্র মুখ। দেখতে-দেখতে ভেবে পেলুম না এই মানুষকে কেমন ক'রে লোকে ঠকাতে পারে।

লণ্ঠনটা তেলের অভাবে দপদপ করছিলো, তার ভুতুড়ে ছায়াটা নড়ছিলো দেয়ালে। ভেজানো দরজাটা খুলে দিয়ে হা-হা ক'রে এক ঝলক হাওয়া ঢুকলো ঘরে, ভাঙা জানালাটা কঁকিয়ে উঠলো। বেদনার্ত মালতীদিকে সহসা আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে বললুম, 'এভাবে আর কতদিন কাটবে?'

'ঈশ্বর জানেন।' মালতীদি তাঁর সিলিংয়ের ঘুণে খাওয়া কড়িকাঠের দিকে তাকালেন, ঈশ্বরকে খুঁজলেন বোধহয়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তিনটে মাস তো এ-ভাবেই কেটে গেল।'

রাস্তা দিয়ে বিকট চীৎকারে হল্লা করতে-করতে মড়া নিয়ে গেলো একদল লোক, আমি সভয়ে চারদিকে তাকালাম, খড়খড় ক'রে আরশোলা উড়লো, পাখার ঝাপটায় সেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মালতীদি হাসলেন 'যেমনি হরি-ধ্বনির উৎপাত তেমনি আরশোলার যন্ত্রণা। তোর বুঝি ভয় ঢুকে গেল। নিশ্চয়ই আর কখনো এমুখো হবি না।'

গা ছমছম করছিলো আমার, জানালার নিবিড় অন্ধকারে চোখ রেখে বললাম, 'না। আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।'

'তোর সঙ্গে? তা তো যাবোই। ট্রাম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে আসবো তোকে।'

'ট্রাম পর্যন্ত বলিনি, বাড়ি পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাবো আমি। যতোদিন অন্য কোনো সুবিধে না হয়, আমার ওখানেই আপনাকে থাকতে হবে।'

'পাগলি।' মালতীদি আদর করলেন আমাকে, 'এতো ভাবছিস কেন তুই? আচ্ছা বোকা তো। আমার কিন্তু এখানে বেশ লাগে।'

'সে-সব আমি শুনবো না।'

একটু চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মালতীদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'দেখিস, ও ঠিক আসবে। ঠিক এসে আমাকে নিয়ে যাবে। কিছুতেই আমাকে থাকতে দেবে না এখানে।'

'এখনো আপনার আশা গেলো না?'

'আশা কি যায়? আশা গেলে আর থাকবে কী রে?'

'থাকবে আপনার কঙ্কাল। নরনারায়ণ যা নেবার নিয়েছে, আর তার কোনো দরকার নেই আপনার কাছে। কথাটা নিষ্ঠুর হ'লেও ঠিক। আপনি শক্ত হোন মালতীদি।'

'তুই ভাগ্য মানিস না কেন? যার ভাগ্যে যতোদিন কর্মভোগ তা তো হবেই।'

'আপনিই বা পুরুষকার মানেন না কেন? ভাগ্য তো পুরুষকার ছাড়িয়ে নয়। আলো-আঁধারের মতো ওতোপ্রোতভাবে জড়ানো।'

'আমি যুদ্ধ করতে পারি না মণি। ভেসে চলাই আমার স্বভাব। তাই ব'লে একদিন কি তরী ভিড়বে না কোনো ঘাটে?' বলতে-বলতে মালতীদির গলাটা ভেঙে এলো, পরমুহূর্তেই কেমন অন্য রকম হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'শকুন্তলার কথা ভেবে দ্যাখ—'

'শকুন্তলা! সে কে?'

'কালিদাসের শকুন্তলা। অত প্রেম, অত প্রণয়, কী হ'লো তারপর? দুষ্মন্ত চিনতেই পারলো না তাকে। ভাগ্যের অভিশাপ। আমার ভাগ্যে কখন কার অভিশাপ লেগেছে কে বলবে। শেষে তো কত দুঃখ বিরহের পরে মিলন ওদের হ'লো?'

মালতীদি বলছেন কী? মাথা-খারাপ হ'লো নাকি? আমি চুপ ক'রে তাকিয়েছিলাম। মালতীদি চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে আবার বললেন, 'আর তুই নল-দময়ন্তীর কথাই ভাব না। ভাগ্য। ভাগ্য। সব ভাগ্যের লীলাখেলা। কে ঠেকাবে তাকে? কোন পুরুষকারের এত শক্তি আছে যে ভাগ্যকে এড়িয়ে যাবে?'

এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম, দরজার দিকে আসতে-আসতে বললাম, 'তবে তা-ই থাকুন, দেখুন ভাগ্য আপনাকে কোন স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি আজ চলি।'

মালতীদি বাইরে এসে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে আমার পিঠের উপর হাত রাখলেন, বললেন, 'আকাশটাকে দেখ কী কালো। তোর কী মনে হচ্ছে না এই কালো অনন্ত? অনন্তকাল ধ'রে এই আঁধারেই বাঁচতে হবে আমাদের? অথচ রাতটুকু কাটলেই তো মস্ত লাল গোল সূর্যের আগুন ধুয়ে দেবে সব অন্ধকার। সব দুঃখ মুছে দেবে আলোর বন্যায়। কোথায় থাকবে এই হতাশার বোবা বেদনা। এই অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়েই তো সূর্যের জন্ম।'

কী অদ্ভুত বিশ্বাস। আমি চুপ।

'তাই বলছি তুই ভাবিসনে। সব একদিন ঠিক হ'য়ে যাবে। রাত কাটিয়ে সূর্যের দেখা আমিও পাবো। ও আসবে। আসতেই হবে। কেবল কী মনে হয় জানিস?' এখানে মালতীদির গলা আবার সহজ হ'য়ে ধ'রে এলো, 'যদি কোনোরকমে একটা বাচ্চার মা-ও হ'তে পারতুম—'

১১

বাড়ি এসে সেই রাত্রে একবিন্দু ঘুমুতে পারিনি আমি, একবারের জন্য ভুলে যেতে পারিনি মালতীদির কথা। চোখ যতোবার তন্দ্রায় ভেঙে এসেছে ততোবার বিশ্রী-বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘেমে জেগে উঠেছি। ভয়ে ধুক্‌ধুক্ করছে বুকের ভেতরটা, বিষাদে মন ভ'রে গেছে।

আমার দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার স্বামীকে বলেছিলাম একটা মামলা ক'রে দিতে, বলেছিলাম লোকটাকে সকলের কাছে অপদস্থ করার সব উকিলি ফন্দি বার করতে। তিনি রাজি হননি। খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে মুখ তুলে মৃদু হেসে বলেছিলেন 'উল্টো সাক্ষী দিয়ে তোমার মালতীদি শেষে আমাকেই ফ্যাশাদে ফেলবেন। যে-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তিনি একটা চাকরি পর্যন্ত করতে পারেন না, সে-স্বামীর নামে মামলা করবেন এ-কথা ভাবাটা নিতান্তই ছেলেমানুষি। আর তাছাড়া, যাই বলো, ভদ্রমহিলার মাথারও একটু গোলমাল আছে।'

'কী!' তৎক্ষণাৎ আমি ভ্রূকুটি করলাম। আমি নিজে যা-ই ভাবি না কেন, বলি না কেন, আর কারো মুখ থেকে মালতীদির প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধা আমি সইতে পারি না।

কয়েকদিন পরে কোনো-এক অপরাহ্ণে যখন জ্যৈষ্ঠের লম্বা বেলা যাই-যাই ক'রেও গাছের মাথায়, পাতার ফাঁকে-ফাঁকে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদে, অন্দরে জানালার শিক গ'লে লাল সিমেন্টের মেঝেতে তার স্তিমিত জ্যোতি নিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলো জেদি ছেলের মতো, আর আমি সবে দিবানিদ্রা সেরে বৈকালিক চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত, এমন সময় রোদে গরমে লাল হ'য়ে মালতীদি এসে হাজির। আমি রান্নাঘরের দরজা ছেড়ে বসার ঘরে এলাম। 'ও মা, আপনি! আমি আজই ঠিক আপনার কথা ভাবছিলাম।'

'ভাবছিলি বুঝি?' মালতীদি ছোট্ট রুমালে মুখ মুছে হাসলেন, 'সে-কথাটা কি আমাকে দেখে মনে পড়লো?'

'বাঃ, তা কেন?'

'তবে যাসনি কেন?'

'বললে তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আজ আমি যাবার কথাই ভাবছিলাম।'

'জানিস, আমি তোর জন্য রোজ আশা ক'রে ব'সে থাকি? তুই আসবি ব'লে ভালো চা কিনেছি, স্টোভ সারিয়েছি, একটিন বিস্কুট পর্যন্ত এনে রেখেছি। সেদিন তোকে কিছু দিতে না-পেরে আমার যা কষ্ট হয়েছিলো।

'কী আশ্চর্য! আপনার কাছে আমি তো আপনার জন্যেই যাবো। তার জন্য আবার উপকরণ লাগবে নাকি?'

'উপকরণ একটু চাই-ই জীবনে। ওটা অলংকার। প্রিয়সঙ্গ আরো প্রিয় ক'রে তুলতে এক কাপ চা কি কম ভাবিস তুই?'

পাখা ছেড়ে দিলাম। বললাম, 'বসুন, ঠাণ্ডা হোন। বাইরে তো বোধহয় এখনো আগুন জ্বলছে। কত কষ্ট হয়েছে আসতে।'

'কষ্ট কী রে? এক গ্লাশ জল দে।'

'নিশ্চয়ই।' জল নিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি খাবার তৈরির জন্য একটা তাগিদ দিয়ে এলাম রান্নার লোকটিকে, কাছে ব'সে বললাম, 'নতুন খবর কী বলুন।'

'নতুন খবর একটু আছে', মালতীদির হাতে একটা প্যাকেট ছিলো, তা থেকে একটি বই বার ক'রে টেবিলের উপরে রাখলেন, 'তোকে বলেছিলুম জীবনী লিখেছি একটা, তার প্রথম খণ্ডটা এই আজই নিয়ে এলাম প্রেস থেকে। তোদের দিতে এলাম।'

বইখানা হাতে নিয়েই উৎসর্গের পাতাটায় আমার চোখ থামলো, 'তা হ'লে স্বামীকেই—'

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মালতীদি একটু বেশিরকম সপ্রতিভভাবে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, স্বামীকেই উৎসর্গ করলাম। আশা করি এবার আর সম্পর্কটাকে অস্বীকার করতে পারবে না। হাজার হোক, ছাপার অক্ষর তো। ভালো বুদ্ধি করিনি?'

'কী জানি—'

আমার উদাস ভঙ্গিতে মালতীদি ভুরু কুঁচকোলেন, 'কী জানি বললি কেন? বল, নিশ্চয়ই। তোরা আমাকে যতো বোকা ভাবিস আসলে আমি যে সত্যি ততটা নির্বোধ নই সেটা অন্তত স্বীকার কর। দশজনকে কথাটা জানাবার এর চেয়ে ভালো উপায় আর তুই কী ভাবতে পারিস!'

'জানা না জানায় আর কী বা এসে যাচ্ছে।'

'কী না? মান-সম্মান বজায় রাখতে হবে তো?'

'আর মান-সম্মান। আপনার দুঃখ কি তাতে একতিল কমবে?'

'আমার দুঃখ!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মালতীদি, 'বলেছি তো যতোদিন ভোগ আছে—'

অসহিষ্ণু হ'য়ে বললাম, 'মামলা করবেন বলেছিলেন, সেটা করুন, সব ভোগ একদণ্ডে কেটে যাবে। স্ত্রীর অধিকার বই লিখে কেঁদে-কেটে উৎসর্গ ক'রে জানানোর চাইতে ওর মতো মানুষকে আইনের সাহায্যে জানালেই কাজ হবে বেশি।'

'তোর বুঝি তাই ধারণা?'

'আপনি নিজেই তো সে-কথা বলেছিলেন।'

'ও, সেদিনের কথা বলছিস?'

'আমি ফিরে এসে আমার স্বামীকেও বলেছি।'

'কী বললেন?'

'বললেন, আপনি শেষে না উল্টো সাক্ষী দিয়ে বসেন এটাই তাঁর একমাত্র ভাবনা।'

'উল্টো সাক্ষী দেবো কেন?'

'বলা কি যায়?' বিরূপ না-ক'রে পারলুম না, 'যে-রকম পতিপ্রাণা।'

'পতিপ্রাণাই বটে।' ব্যথিত মুখে মালতীদি হাসলেন, তারপর ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ চলি, বুঝলি?'

'এখুনি?' আমি অবাক।

'অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

'তাই ব'লে একটু বসবেন না, এই তো এলেন।'

'আজ ছেড়ে দে।'

'চা খেয়ে যান অন্তত।'

'না না, অনেক দেরি হ'য়ে যাবে।'

'স্বামীর সঙ্গে মামলার কথা বললাম ব'লেই কি রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছেন?

'কী যে বলিস।'

'আমার কিন্তু তা-ই মনে হচ্ছে।'

'সে-বিষয়ে আমি ভাবছিই না। আমি ভাবছি বইটা দেখে ও কী বলবে।'

'ছাই বলবে।' মালতীদির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি ঠোঁট বাঁকিয়ে বললাম, 'তাকিয়ে দেখবার আগেই সব কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।'

'কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে?'

'বাধা কী? ক' কপি ছেপেছেন?'

'পাঁচশো।'

'পাঁচ সিকে দামের পাঁচশো কপি বই কিনে ফেলতে ওর আটকাবে কোথায়?' মালতীদি চুপ ক'রে রইলেন। আমি বললাম 'আর তাছাড়া এ-বই ওর চোখেই পড়বে না হয়তো।'

'কেন পড়বে না?'

'না-ও তো পড়তে পারে।'

'আমি নিজে হাতে ক'রে দিয়ে আসবো।'

'আপনি নিজে যাবেন এই বই নিয়ে?'

'দোষ কী?'

'না, দোষ আর কী।'

'তাই ব'লে তুই ভাবিস না ওর বাড়িতে যাবো আবার।' যেন সান্ত্বনা দিলেন আমাকে। 'অত ইয়ে নয়। ওর এক বন্ধুর বাড়ি রোজ বিকেলবেলা তাস

খেলতে আসে, সেখানে যাবো। বইটাও দেবো, দুটো ভালোমন্দ কথাও শুনিয়ে দিয়ে আসবো আচ্ছা ক'রে।'

'তা হ'লে তাই যান।' আমি গম্ভীর হ'য়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'সেটাই ঠিক হবে, কী বলিস?'

'আমি কী ক'রে জানবো, বলুন। ও-সব আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কিছু না-বলাই উচিত।'

'এটা তোর রাগের কথা।'

'রাগ করবো কেন?'

'সবাই করছে, আর তুই-ই বা কেন বাকি থাকবি। অথচ এ-কথাটা কেউ ভেবে দেখছে না লোকটার সঙ্গে যদি ঝুপ ক'রে একটা মামলা ক'রেই ফেলি, তার অর্থটা তো এ-ই দাঁড়ায় যে আর আমার তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রইলো না। সম্পর্কটাকে উপড়ে ফেলা কি এতই সহজ?'

এর পরে আর কী বলা যায়? মালতীদি ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চ'লে গেলেন, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে মনে-মনে বললাম, 'পরের বিষয়ে নিজের মাথা না-গলানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মালতীদির ভালোমন্দ তাঁর নিজের, আমার নয়, আমি আর তাঁর বিষয়ে কখনো কিছু ভাববো না।'

১২

অবিশ্যি ভাবতেও হ'লো না। সেই যে তিনি গেলেন আর একমাসের মধ্যে এলেন না। আমিও গেলুম না। লাভ নেই গিয়ে। তাঁর অবস্থা জানি, তাঁর স্বভাবও জানি। মিছিমিছি মেজাজ খারাপ, মনও খারাপ হ'য়ে যায়। তাঁর ভালোবাসার জোরে তিনি সবই সইতে পারেন, হয়তো বা তাঁর এই নিষ্ঠা প্রশংসনীয় কিন্তু আমার ভালো লাগে না। রাগ হয়। এ-বিষয়ে তাঁর আদর্শ আর আমার আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা, আমি তাঁর জগৎ থেকে এ-বিষয়ে একান্তই অন্য মানুষ। তবে আর কী হবে গিয়ে?

আমার স্বামী একদিন বললেন 'তোমার মালতীদির খবর কী?'

বিরক্ত হ'য়ে জবাব দিলুম, 'জানিনে।'

'আর তো এলেন না?'

'না-আসাই ভালো।'

'রাগ করছো কেন?'

'রাগ আবার কী? মালতীদির মতো মানুষের কষ্ট পাওয়াই উচিত।'

'বইখানা কিন্তু সুন্দর লিখেছেন। পড়ছিলাম, ভালো লাগলো।'

'ঐ পারেন শুধু।'

'নিতান্ত কম পারা নয়। মহিলার জন্য আমার দুঃখ হয়।'

'আমার হয় না।'

'একদিন তো গেলেও পারো।'

'আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ কী।'

সেই প্রসঙ্গে ছেদ টেনে অন্য কাজে মন দিলুম। দিলুম বটে, কিন্তু মন থেকে মানুষটাকে যে কেন মুছে ফেলতে পারি না কে জানে।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো আবার মালতীদি হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে উপস্থিত।

'তোর স্বামী কোথায় রে?' দারুণ ব্যস্তসমস্ত প্রশ্ন। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস নয়, আষাঢ়ের মাঝামাঝি। সেদিন মালতীদি লম্বা বেলার রোদ্দুরে জলতে-জলতে আসেননি, বর্ষার টিপটিপ অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে এসেছেন। বেলা চারটেতেই আলো ক'মে গেছে ঘরের, মনে হচ্ছে এরি মধ্যে রাত নেমেছে বুঝি। মেঘলা বিকেলের সেই ধূসর আলোয় মালতীদির দিকে তাকিয়ে দেখলুম চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা। পরনের শাড়িটা তাঁর আধময়লা, ভিজে গিয়ে সেঁটে বসেছে শরীরে, চুলগুলো এলোমেলো, পায়ের জুতোজোড়া কাদা মাখা। সবটা মিলিয়ে অত্যন্ত দীন দেখাচ্ছিলো।

'এই বৃষ্টিতে?' রাগ ভুলে ব্যস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি তোয়ালে এনে দিলুম—'শিগগির মুছে ফেলুন। শাড়িটা ছাড়ুন।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। তুই বোস। অসিতবাবু বাড়ি আছেন কিনা আগে সে-কথা বল।'

'উনি তো এখনো কোর্ট থেকে ফেরেননি। কী হয়েছে?'

'কী হয়নি? বাড়িওলা বার ক'রে দিয়েছে, মুদি ধার দিচ্ছে না, ধোপা কাপড় আটকে রেখেছে, এককোঁটা কেরোসিন ঘরে নেই যে আলো জ্বালবো।

এমন কি, কোথাও যে যাবো তার ট্রামভাড়াটি পর্যন্ত নেই। আর তারপরেও জিজ্ঞেস করছিস কী হয়েছে?' চোখ দুটো ছোটো ক'রে তিনি এমন তির্যক-ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন সে-সবের জন্যে আমিই দায়ী। একটু নিষ্ঠুর হ'য়ে বললুম, 'স্বামীর জন্য এইরকম কৃচ্ছ্রসাধন সতীলক্ষ্মীরা তো চিরকালই ক'রে থাকেন। হাজার হোক, পতি হলেন পরমগুরু, গুরুর গুরু মহাগুরু, ইহলোক, পরলোক দুই লোকেরই একাধিপতি। এর মধ্যে আর অসন্তোষের কী থাকতে পারে?'

খড়ের আগুনের মতো দপ ক'রে জ্ব'লে উঠে স্বভাববিরুদ্ধভাবে রেগে গিয়ে বললেন, 'টিটকিরি দিচ্ছিস, না? তা তো দিবিই। তোর স্বামীর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি যে। ঠাট্টাটা তাই তো এতো সহজে করতে পারলি।' ব'সে ছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আমার যে কেউ নেই তা তো আমি জানিই, তবু মাঝে-মাঝে ভুলে যাই কথাটা।'

অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি হাত ধ'রে বিনীত অনুরোধে বসিয়ে দিয়ে নরম গলায় বললাম, 'রাগ করছেন কেন? অবস্থাটা তো আপনি নিজেই এখানে এনে ফেলেছেন। তাই বলছিলুম—'

'তাই বলছিলি যে নরনারায়ণের ইচ্ছেমতো রক্ষিতা হ'য়ে ওর আলিপুরের বাগানবাড়িতে গিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করি, না? তা হ'লে তো আর কোনো ভাবনা থাকে না, খেতেও পাবো, পরতেও পাবো, আর মাথার উপর ইটের আচ্ছাদনও থাকবে। আমাকে তোরা ভাবিস কী?'

অবাক হ'য়ে বললাম, 'আমি কেন সে-সব বলবো? বলেছি কখনো? আপনি যদি আমার কথা শোনেন তা হ'লে আমি এখন আপনাকে ওর বিরুদ্ধে মামলা করতেও বলবো না। কারণ আমি ভেবে দেখেছি নরনারায়ণের টাকার জোর এতো বেশি যে মামলা করলেও সহজে তাকে কাবু করতে পারবেন না। হয়তো বা আপনাকেই দশের কাছে অপদস্থ হ'তে হবে। যে শয়তান চরিত্র—কী থেকে ও কী কথা টেনে আনবে তা কি জানেন? তার চেয়ে ওকে সম্পূর্ণ-ভাবে মন থেকে ছেঁটে ফেলে, ভুলে গিয়ে, আবার আপনি আগের মালতীদি হ'য়ে উঠুন। এ-কথা আপনাকে আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি—আপনার অভাব কিসের। আপনার মতো বিদুষী মেয়ে, যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন সেখানেই ভালো কাজ পাবেন।'

'কাজ! আমি কেন কাজ করবো শুনি? ও নিজে কোনোদিন কাজ করেছে? ওর আদরিণী স্ত্রী কোনোদিন কাজ করেছে? থাকে তো সব বাপের গদিতে ব'সে। আর আমি সে-বাড়ির একজন বিশেষ অংশীদার হ'য়ে একটা সামান্য চাকরি ক'রে জীবন কাটাবো? এর ওর দরজায় ধন্না দিয়ে বেড়াবো? না। কোনোমতেই না। শিদে আঙুলে তো ঘি উঠবে না। বাছাধনকে একবার আদালতের ঘোলটি খাওয়ালেই টেরটি পাবেন। গোপাল-নগরের বারো লক্ষ টাকার সম্পত্তির ছোটো বৌরানী হিসেবে আমার যা পাওনা তার একটি আধা পয়সা আমি ছাড়বো না ওর কাছে।'

কী আর জবাব দেবো। বুঝলাম, মালতীদি উদ্‌ভ্রান্ত। অসংলগ্ন। তাঁর চিরকালের শান্ত নম্র মুখ রাগের আগুনে লাল। চিরকালের মৃদু মালতীদি বারুদের মতো উগ্র।

একটু পরে আমার স্বামী এলেন, মালতীদি আমাকে ছেড়ে তাঁর সঙ্গেই আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন এবার।

হাত মুঠো ক'রে টেবিল চাপড়ে উগ্র হ'য়ে বললেন, 'এতোদিনও সয়ে-ছিলাম, কিন্তু আর না। আর আমি ওকে ছাড়বো না। ও যেমন আমাকে পথের ধুলোয় মাড়িয়ে গেলো, ওর মাথাও আমি হেঁট ক'রে দেবো সকলের কাছে। তার জন্যে আমাকে দিয়ে যা করাবেন তা-ই করবো, যা বলাবেন তা-ই বলবো। কষ্টের আমি শেষ সীমায় পৌঁচেছি অসিতবাবু, শুধু আপনি আমার সহায় হোন।'

'সেজন্যে আপনি ভাববেন না,' আমার স্বামী কোটটা খুলে সোফার পিঠে ঝুলিয়ে রেখে শান্ত গলায় বললেন, 'আমার সাধ্যমতো আমি আপনার পক্ষে দাঁড়িয়ে সবই করবো। তবে কী জানেন? এ-সব ভারি বিশ্রী ব্যাপার। প্রথমত টাকাকড়ির প্রশ্ন তো আছেই, তাছাড়া আপনার যিনি স্বামী, নরনারায়ণ চৌধুরী, তাঁর যদি কোনো বিবেক না থেকে থাকে, তাহ'লে খোরপোষ না-দেবার জন্য আপনার বিরুদ্ধে তিনি এমন সব কদর্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন যেটা স্ত্রী হিসেবে আপনার ভারি অপমানজনক বলে মনে হবে।'

'কী তিনি প্রমাণ করবেন? কী আমি করেছি? তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা ছাড়া আর আমার কী দোষ আপনারা দেখেছেন? সত্য নেই? ধর্ম নেই?

পাপের শক্তি কী এতোই বড়ো যে কোর্টে দাঁড়িয়ে শুধু কতগুলো মিথ্যে কথা ব'লেই লোকটা জিতে যাবে? আর টাকা! টাকা আমি যে ক'রে পারি জোগাড় করবো, আমি দেখবো নরনারায়ণ চৌধুরী কী ক'রে আমাকে তার স্ত্রী ব'লে অস্বীকার করে। অসিতবাবু, শুধু আপনি আমাকে দয়া করুন।'

'না, না, দয়ার কথাই উঠছে না এখানে। আপনি কাল আপনাদের বিবাহের কাগজপত্র সব নিয়ে এলেই আমি যা করবার সব করবো।'

বেয়ারা চা আর খাবার নিয়ে এলো, আমি বললাম 'ভিজে এসেছেন, শাড়িটা তো শরীরেই শুকোলেন, মাথাটাও ভালো ক'রে মুছলেন না, এবার শান্ত হ'য়ে খেয়ে নিন তো একটু।'

এ-কথায় আমার দিকে তাকিয়ে মালতীদি সংবৃত হলেন, তাঁর চোখে লজ্জার ছায়া ভাসলো। চোখ নামিয়ে বললেন 'এতোক্ষণ ধ'রে বড়ো চেঁচামেচি করছিলাম, না রে? এই আমার মস্ত দোষ হয়েছে। এতো রাগ হ'য়ে যাই আজকাল যে কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

চা ঢেলে দিয়ে বললুম, 'সেটাই যা একটু বাঁচোয়া। এতোকাল এতো বেশি কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন যে এখন একটু তার অভাব ঘটাই মঙ্গল। আরো কিছু আগে ঘটলে আরো ভালো হ'তো।'

'তুই আমার সবই ক্ষমা করিস দেখছি। আমার সব ব্যবহারেরই সদর্থ খুঁজে পাস। তা নৈলে ভদ্রলোক ক্লান্ত হ'য়ে কোর্ট থেকে ফেরা মাত্রই আমি যেরকম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তাতে তোর রাগ করাই উচিত ছিলো।'

আমার স্বামী হেসে বললেন, 'উনি জানেন এই উকিল ভদ্রলোকটি ঐটুকুর জন্যই সারাদিন কোর্টে গিয়ে শিকারীর মতো ওৎ পেতে ব'সে থাকেন। মাকড়শা যেমন জাল বিস্তার ক'রে পোকা ধরে আমরাও তো তেমনি ক'রেই মক্কেল ধরি কিনা। আর আপনি হলেন আমার সাধা লক্ষ্মী, আপনার উপর কখনো উনি রাগ করতে পারেন?'

এ-কথায় মালতীদি সরল গলায় হেসে উঠলেন, আমিও হাসলাম। তারপর প্রসঙ্গ বদলে অন্য কথাবার্তায় সহজ হ'য়ে উঠলো আমাদের চায়ের আসরটি।

বিদায় নেবার সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মালতীদি বললেন, 'আমি ঐ টালিগঞ্জের বাড়িটা কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি রে।'

'তা-ই নাকি? বলেননি তো।'

'মনে ছিলো না।'

'কবে ছাড়লেন ?'

'এই তো আজ। ছাড়লাম মানে বাড়িওলা তুলে দিলো।'

'তুলে দিলো !'

'কী করবে, ভাড়া পাচ্ছিলো না ঠিকমতো। সকালে বেরিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্য, ফিরে গিয়ে দেখি জিনিশপত্র সব উঠোনে ছড়ানো, ঘর-দোর ধোয়ানো হচ্ছে। কী ব্যাপার ? না, নতুন ভাড়াটে ঠিক হয়েছে।'

'তারপর ?'

'তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে জিনিশপত্র নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি উঠলাম গিয়ে। শিগগিরই একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে আর কি।'

'ভারি তো ইতর আপনার বাড়িওলা।'

'বেশি আর কী। বাড়ি ছাড়তে একমাস ধ'রেই বলছিলো। ভাড়া বাকি প'ড়ে গিয়েছিলো অনেক, শোধ না-ক'রে তো আর উঠতে পারি নি, পরে দেবো বললেও বাড়িওলা বিশ্বাস করবে না, জিনিশ আটকে রাখবে। কাল রাত্রে ভাড়াটি পেয়েই সকালে ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে নিয়েছে। মেজাজটা তো আমার সেজন্যেই এতো খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো। তুই-ই বল, বাড়ি ফিরে যদি বাড়ি না পাই কেমন লাগে ?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আপনি বাড়িওলাকে কিছু বললেন না ?'

'কী আর বলবো। ওর সঙ্গে আমি কী কথা বলতে পারি ? ভাড়া দিতে পেরেছি, সেটুকুই আমার জবাব।'

'আমি হ'লে অন্য জবাব দিতাম।'

আমার রাগি মুখের দিকে তাকিয়ে মালতীদি হাসলেন।

আমি দু পা এগিয়ে এসে মালতীদির হাত জড়িয়ে ধরলাম, 'চলুন, আপনার বাড়িওলার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি, জিজ্ঞেস ক'রে আসি মালিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর জিনিসে সে হাত দিয়েছে কোন অধিকারে।'

গভীর স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন মালতীদি, ঠিক ছেলে-বেলাকার মতো ক'রে আমার গালে আস্তে একটি টোকা মেরে বললেন, 'পাগলি।' তারপর তরতর ক'রে নেমে গেলেন। আমি চেঁচিয়ে বললাম,

'শুনুন, কাল আসছেন তো ? মালতীদিও তাঁর পক্ষে যতোটা সম্ভব গলা তুলে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'কাল থেকে কিন্তু এখানেই থাকতে হবে, যতোদিন বাড়ি না পান।'

'খুব ভালো কথা—' মালতীদির গলা মিলিয়ে গেল।

মালতীদির সঙ্গে তাঁর সুস্থ অবস্থায় সেই আমার শেষ দেখা।

১৩

কথামতো পরের দিন মালতীদি আসেননি। তারপরের দিনও না, তারপরেও না। কতো ভাবলাম, কতো চিন্তা করলাম, কতো মন-খারাপ হ'লো, তবু মালতীদি এলেন না। ঠিকানাও জানি না যে খোঁজ নেবো। একদিন ওঁর পুরোনো বাড়িতেও গেলাম, যদি বা কোনো হদিশ মেলে। নতুন ভাড়াটে এসে জঙ্গল-টঙ্গল সাফ করিয়ে বাড়ির চেহারাটা একটু ফিরিয়েছে দেখলাম। উঠোনের রোদ্দুরে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে খেলা করছিলো, আমার সব কথার জবাবেই তারা জিব দেখালো, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করলো, বক দেখেছো বললো, ভেংচি কাটলো, হেসে এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়লো। অন্য গলার সাড়া পেয়েই বোধ হয় ভেতর থেকে তাদের ব্যতিব্যস্ত মা যখন রান্না করতে-করতে ছুটে এলেন খুন্তি হাতে, ছেলেরা অমনি এক মুহূর্তে হাওয়া হ'য়ে কোথায় পালিয়ে গেলো। খাটো অসংবৃত আঁচল টানতে-টানতে ভদ্র-মহিলা বললেন, 'আসুন, বসুন, জঙ্গলের মধ্যে থেকে-থেকে ছেলেগুলো জংলি হ'য়ে গেছে। স্বামী ফরেস্ট অফিসে চাকরি করেন কিনা, লোকজনের মুখ তো ওরা দেখে না, সব একেবারে বেবুনের বংশধর। আর কলকাতা এসেও কী জায়গাতেই না ঠাঁই মিলেছে। দিনের মধ্যে কমসে কম গুটি দশেক কিল পিঠে না-পড়লে কি আর এরা শায়েস্তা থাকে ?'

বাচ্চাগুলোর ব্যবহারে হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলাম, তাদের মার কথায় কৌতুক বোধ করলাম। বললাম 'সব কটিই আপনার ?'

'আবার কার ? শেষের দু'বার তো আবার ডবল প্রমোশন। এই রেটে চললেই হয়েছে আর কী।'

'হু' একটি যমজ আছে বুঝি ?'

একগাল হাসলেন ভদ্রমহিলা, 'নৈলে বিয়ে হয়েছে সাত বছর, আটটা বাচ্চা হবে কেমন ক'রে।'

মহিলার কথা শুনে না-হেসে পারলাম না।

'আসুন না', উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমাকে বারান্দায় মোড়া এনে পেতে দিলেন। জাঁকিয়ে ব'সে বললেন, 'লোকজন এতো ভালোবাসি, অথচ কপাল দেখুন। এসেছি অবিশ্যি মাত্রই কয়েক মাসের জন্য। আবার চ'লে যাবো। বাড়িটা বিশ্রী।'

'এখানে আমার এক বন্ধু থাকতেন—' এতোক্ষণে আমি আমার বক্তব্যে আসবার সুযোগ পেলমে।

ভদ্রমহিলা লুফে নিলেন কথাটা। 'আপনার বন্ধু ? কে বলুন তো ? আমাদের আগে তো শুনেছি মস্ত এক জমিদারের স্ত্রী থাকতেন, তিনি নিজে আবার মস্ত লেখিকা। আমি তাঁর বই পড়েছি। খুব ভালো লেগেছে। এখানে ঐ বামুনপাড়ার ছোঁড়ারা মিলে একটা লাইব্রেরি করেছে না, সেখান থেকে এনেছিলাম। বন-জঙ্গলে থাকি, রক্তমাংসের মানুষ তো আর দেখি না, আমার স্বামী বলেন তার চেয়ে বইয়ের মানুষেরা নাকি ঢের ভালো, ঢের বেশি নিরীহ। উনিই আমার এই বিশ্রী বইপড়া রোগ ঢুকিয়েছেন।' তাই এখানে এসেও খুঁজে-পেতে লাইব্রেরিটা বার ক'রে চাঁদা দিয়ে তার মেম্বর হ'য়ে নিয়েছি।'

আমি আগ্রহান্বিত হ'য়ে বললাম, 'তাঁকে কি আপনি দেখেছেন ? তাঁর কোনো খবর কি আপনি—'

'কপাল আমার ! আস্তো একজন লেখক মানুষকে চোখে দেখবো আমার কি তেমন ভাগ্য ! বাড়ি নেবার সময় বাড়িওলাই ফলাও ক'রে বলেছিলেন সে-কথা। মালতী দেবী নাকি এ-বাড়িতে ব'সেই ওঁর সব লেখার খোরাক পেয়েছেন। ছ'টি মাস তিনি এখানে অজ্ঞাতবাস ক'রে গেছেন শুধু প্রকৃতির শোভা থেকে লেখার কাজ সংগ্রহ করবার জন্য। হ্যাঁ ভাই, বলুন না, লেখকরা কি সবাই অমনি ক'রে লেখেন ?'

লেখক সম্পর্কে ভদ্রমহিলার কোনো কৌতূহল আমি নিবারণ করতে পারলুম না। বাড়িওলার ধৃষ্টতায় অবাক হ'য়ে, যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললুম, 'আমি আমার সেই বন্ধুর খোঁজেই এসেছিলাম।'

'কেন, এ-বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেছেন জানিয়ে যাননি আপনাদের ?'

'না।'

'ঐ দেখুন, আবার কোথায় গিয়ে ডুব মেরেছেন কে জানে। এঁরা হলেন সাধকের মতো মানুষ, যতো লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবেন ততোই ওঁদের কাজ ভালো হবে বেশি। শুনেছি নিঃসন্তান। তা তো হবেনই। আমাদের মতো শুয়োরের পাল জন্ম দিতে তো আর আসেননি সংসারে।'

হয়তো তা-ই। কথাটা শুনলে মালতীদি সুখী হতেন। হাত জোড় ক'রে বললাম, 'এবার তবে আসি ?'

'এখুনি ? আপনার সঙ্গে যে এখনো আমার পরিচয়ই হ'লো না।'

'আবার আসবো একদিন। দেখে গেলাম, বেশ লাগলো।'

সত্যি বেশ লেগেছিলো।

তিন মাস পরে মালতীদির এক আত্মীয়ের মুখে শুনলাম, মালতীদি হারিয়ে গেছেন। আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'হারিয়ে গেছেন মানে ?'

আত্মীয়টি বললেন, 'তা ছাড়া আর কী বলা যায়, সকালবেলা ভালোমানুষ বাড়ি থেকে বেরুলো, আর ফিরলো না।'

'সে কী !'

'যথারীতি হাসপাতাল, পুলিশ, ইত্যাদি সব রকমই করেছিলাম।'

স্তব্ধ থেকে বললাম, 'উনি ওঁর টালিগঞ্জের বাড়ি ছেড়ে যাঁর বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন তাঁকে কি চেনেন আপনি ?'

'আমার বাড়িতেই তো উঠেছিলো।'

'আপনার বাড়িতে ?'

'হঠাৎ একদিন এসে হাজির। বলে, বিপদে পড়েছি, মামা, কয়েকদিনের জন্য একটা ঘর আমাকে ভাড়া দিন। আমি বললাম, ভাড়া কী রে ? অসুবিধেয় পড়েছিস, যে-ক'দিন থাকবার থাক। ছোটো একটা ঘরে ছেলেমেয়েরা পড়তো, তাড়াতাড়ি সেটা ঠিক ক'রে দিলুম। সব মিলিয়ে দেড়টি বেলা হয়তো ছিলো, তারপরেই যে বেরুলো—আমার মনে হয় কী, জানো ?' ভদ্রলোক গলা খাটো ক'রে বললেন, 'ঐ নারায়ণই ওকে সরিয়েছে।'

'নরনারায়ণই ওঁকে সরিয়েছে ?' আমার দুই চোখ বড়ো হ'য়ে উঠলো।

'মানে, কোথাও আটকে-টাটকে রেখেছে আর কি। মামলা করবে-করবে ব'লে তো একেবারে খেপে উঠেছিলো, তা করবি কর। এতো বলা-কওয়া কিসের? হাজার হোক, অত বড়ো একটা জমিদার, মানী লোক, এ-রকম একটা মামলা হ'লে দেশে তো একটু চিচিক্কার উঠতোই। তাছাড়া শুনেছি রাজা রাঘবেন্দ্রনারায়ণ নাকি এ-বিয়ের খবর জানতেন না। জানলে ছেলেকে তৎক্ষণাৎ গদি থেকে সরাতেন। জানি সব। ওরা তো আমাদের অজানা ঘর নয়। রাঘবেন্দ্র হচ্ছে একটা বাঘ। এক বৌ থাকতে বাপকে না-জানিয়ে যেমন-তেমন ঘরের যে-কোনো একটা মেয়েকে বিয়ে করবে, আর জানবার পরেও তিনি চুপচাপ ব'সে থাকবেন, সে-পাত্রই সে নয়।' আমি চুপ হ'য়ে গেলাম। ভদ্রলোক একটিপ নস্যি নিয়ে গলা চড়িয়ে ভুরু কুঁচকে আবার বললেন, 'তা যাই বলো বাপু, মালতীরও আমি দোষ দেবো। সেই বা বলা নেই কওয়া নেই হুম ক'রে একটা বিয়ে করতে গেলো কেন? আর আত্মসম্মান ব'লেও কি কোনো পদার্থ নেই তোর? বেশ তো, মামলা করবি তো কর না, সে-সব আবার তাকে জানাতে যাওয়া কেন?'

'তাকে জানাতে গিয়েছিলেন?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়। কথাটা অবিশ্যি আমার বড়ো মেয়েই প্রথম বললো। ওকে নাকি রাত্তিরে বলেছিলো শেষবারের মতো একবার স্বামীর সঙ্গে সে দেখা ক'রে আসবে, জেনে আসবে স্ত্রী হিসেবে তার ন্যায্য অধিকার নরনারায়ণ দেবে কি দেবে না, তারপর যা ব্যবস্থা করার করবে। তুমিই বলো, ঐ রকম একটা শয়তানের সঙ্গে যেচে সেধে পঞ্চাশবার এ-সব মিটমাটের কোনো মানে হয়? আমাদের চিদানন্দবাবু, ওর পিসতুতো ভাই, তিনি তো এ-সব কারণে ভীষণ চটা ওর উপর। বড়োলোক স্বামী ব'লে কি এমন ক'রেই পায়ের তলার সুখতলা হয়ে থাকবি? তুই নিজেই বা এমন একটা—'

নির্দিষ্ট ট্রাম এসে গেল, অর্ধসমাপ্ত কথা সেখানেই শেষ ক'রে উনি ট্রামে লাফিয়ে উঠলেন।

১৪

এক বছর পরে একটা চিঠি পেলাম :

মণি,

কাল সন্ধ্যায় কলকাতা যাচ্ছি, তোর বাড়িতে উঠবো। শরীর ভালো নেই, কয়েকটা দিন থাকবো ভাবছি।

সামান্য একটা পোস্টকার্ডে মাত্র এই দুটি লাইন। মুছে-মুছে যাওয়া ঝাপসা স্মৃতির পলিমাটি ভেদ ক'রে আবার মালতীদি উঠে এলেন মনের উপর-তলায়। আবার তিনি আমাকে ভাবালেন। ইতিমধ্যে এ-বাড়িতে আর-একটি শিশু জন্মেছিলো, নিজেদেরই জায়গায় অকুলোন হচ্ছিলো যথেষ্ট, মালতীদিকে কোন ঘরে থাকতে দেবো, তা নিয়ে চিন্তা করতে হ'লো একটু। আমার স্বামী বললেন, 'জানি না উনি কোথা থেকে আসছেন বা কী অবস্থায় আসছেন, তবে যদি রাজি থাকেন আমি কিন্তু খুব ভালো একটা কাজ জোগাড় ক'রে দিতে পারি। একেবারে আমার হাতেই আছে।'

আমি বললাম, 'হয়তো কাজই করছেন কোথাও, নইলে আছেন কী ক'রে। চিঠিটা প'ড়ে তো বেশ শান্তিতেই কাটাচ্ছেন মনে হচ্ছে।'

'দু-লাইনেরই চিঠি।'

''তা হ'লেও বোঝা যায় তো।'

'হবে।' ছোকরা চাকরটাকে নিয়ে আমার নিজের বসবার ঘরটাকেই ওলোটপালোট ক'রে মালতীদির জন্য সাজাতে লেগে গেলাম।

অপেক্ষা করছিলাম সন্ধে সাতটা থেকেই, কিন্তু মালতীদি এলেন রাত ন'টায়। কী ব্যাপার? না, পথ ভুল ক'রে কেবল ঘুরেছেন এদিক ওদিক।

'পথ ভুল ক'রে?' অবাক না-হ'য়ে পারলাম না। অবিন্যস্ত বসনে ভূষণে, চলনে ভঙ্গিতে, মানুষটা যেন সম্পূর্ণ অন্যরকম হ'য়ে এসেছেন। ঘরে ঢুকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপ ক'রে ব'সে পড়লেন সোফার মধ্যে, একটু হেসে বললেন, 'শনির দশা চলেছে, মরা শোল মাছ পালিয়ে গেল নলের পাত থেকে, কলি প্রবেশ করলো কানের মধ্য দিয়ে, আর বনের মধ্যে আধখানা আঁচলে শুয়ে দময়ন্তী তাঁর দুই চোখের জলে আঁধার দেখলেন পৃথিবী।' আমার দিকে হাত

বাড়িয়ে দিলেন—'আয়, বোস। তোকে দেখলেই আমার সব দুঃখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়, সংসারটা শুধু জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েই তৈরি নয়, কারো-কারো চোখে মুখে সুখ শান্তির কথাও লেখা আছে। কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'অসিতবাবু ভালো আছেন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

'মেয়ে ভালো আছে?'

'ভালো। তার একটি ভাইও হয়েছে।'

'হয়েছে? একটা ছেলে হয়েছে তোর? আহা, ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন।' খবরটাতে মালতীদি কেমন অস্থির হ'য়ে পড়লেন। ছটফট ক'রে ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললেন, 'কোথায়? কোথায় সে? নিয়ে আয়। আমি তাকে দেখি। কিন্তু কী দিয়ে দেখি বল তো? কী আছে আমার? সব তো গেছে। হ্যাঁ, এই আংটিটা এখনো আছে, ওটা আমি প্রাণে ধ'রে বিক্রি করতে পারিনি, এটাই ওকে দেবো।'

আমি বললাম, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই, সে এলে একদণ্ডে আপনাকে নাস্তানাবুদ ক'রে দেবে। আর আমার সঙ্গে কি আপনার কুটুম্বিতা যে ভদ্রতা ক'রে ছেলের মুখ দেখবার জন্য গিনি বার করতে হবে?'

'একটা ছেলের মুখ দেখা কি তুই একটা সহজ ঘটনা ব'লে মনে করিস? যা মানুষের সারাজীবনের ইচ্ছে। যা ইচ্ছে করি তা নাকি আমরা কখনোই পাই? তবু ইচ্ছে। ইচ্ছের দুরন্ত তৃষ্ণা। যতো দুঃখ, যতো বেদনা, সব তো ঐ ইচ্ছে থেকে। এই ইচ্ছে থেকেই তো যত যন্ত্রণার জন্ম। তবু তাকে মেরে ফেলতে পারি না, ভুলে যেতে পারি না, তার সঙ্গে কিছুই পারি না আমরা। শুধু অসহ্য কষ্টে ছটফট করি। এই ইচ্ছে কী? কে? দেখেছে কেউ? ছুঁয়েছে কেউ? না। তবু সে আছে, আত্মা হ'য়ে আছে, আছে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হ'য়ে। চেপে আছে শরীর মনের উপর ব্যর্থতার বোঝা হ'য়ে। তাই বিশ্বাস করতেই হয় কোনো এক অলৌকিক শক্তির উপর। যার নাম ঈশ্বর। যন্ত্রণায় কাঁদতেই হয় এই ব'লে—"হে ঈশ্বর, দয়া করো, দয়া করো। আমাকে বাঁচাও এই দুর্বৃত্ত ইচ্ছের বন্ধন থেকে। ইচ্ছের এই অদম্য শক্তি থেকে, অদেখা আলোড়ন থেকে মুক্তি দাও আমাকে।" কিন্তু মুক্তি কোথায়? মুক্তি শুধু

মৃত্যুতে।' চুপ করলেন মালতীদি। দুই চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হলেন। আমি হতভম্ব হ'য়ে একটু দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাঘরে চ'লে এলাম চায়ের কথা বলতে। যখন ফিরে এলাম, দেখলাম আমার মেয়েকে আদর ক'রে কোলের কাছে বসিয়ে তিনি মৃত্যু বিষয়েই বোঝাচ্ছেন তাকে, বলছেন 'মৃত্যু হচ্ছে মা, আর জীবন হচ্ছে বাবা, বুঝলে? মৃত্যু আমাদের বিশ্রাম, জীবন আমাদের কর্ম। কর্ম ক'রে-ক'রে যখন আমরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি তখন মা আমাদের ডাকেন, "ওরে আয় রে, একটু ঘুমুবি আয়। আমার কোলে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম করবি আয়।" আমাকে দেখে খুকু সকাতরে তাকালো, আমি বললাম, 'ওকে ছেড়ে দিন মালতীদি, চা খেয়ে নিন একটু।'

'চা? দে।' মেয়েকে ছেড়ে সাগ্রহে চায়ের দিকে ঝুঁকে পড়লেন মালতীদি। চায়ের সঙ্গে অন্যান্য খাবারও আমি সাজিয়ে দিলাম প্লেট ভ'রে, মালতীদি গভীর মনোনিবেশে খেতে আরম্ভ করলেন। দুই চুমুকে এক কাপ চা শেষ ক'রে আর এক কাপ নিজেই ঢেলে নিলেন পট থেকে। বললেন, 'খুব ভালো চা, চমৎকার চা। আর খাবারও খুব ভালো। গিরিডিতে ওরা আমাকে যা চা দিতো। আর খাবার!' চোখে যেন জল এলো মালতীদির। আমি চমকে উঠে বললাম, 'গিরিডিতে? গিরিডিতে ছিলেন নাকি?' 'তবে এলুম কোথা থেকে? নরনারায়ণটা এতো দুষ্টু, কেমন ভুলিয়ে-ভুলিয়ে নিয়ে গেলো জানিস? আমাকে ও চাবি বন্ধ ক'রে রাখতো সারাদিন। আমি তো পালিয়ে এসেছি।'

'তবে আপনি নরনারায়ণ চৌধুরীর পাল্লাতেই পড়েছিলেন?'

'আর বুঝলি?' এক প্লেট খাবারের শেষ শিঙাড়াটি শেষ করলেন মালতীদি—'এবার একটা ছেলে আমার হ'তোই, একেবারে সব ঠিকঠাক। কেবল একটুর জন্যে আটকে গেল। তখন যে আমার কী মন-খারাপ হ'য়ে গেল।' মালতীদির কথা শুনে আমি থ হ'য়ে তাকিয়েছিলাম, তিনি খুব গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'তাই ভাবছি কিছু গয়না গড়াবো। হাত কান গলা সব আমার খালি। মেয়েদের কি গয়না না হ'লে মানায়? তুইই বল্।'

আমার আর বলবার কী ছিলো? দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলাম।

'আর সুন্দর না-হ'লে পুরুষ ভুলবে কিসে? সবাই বলে আমার নাকি ছেলের মা হবার বয়েস নেই। বললেই হ'লো! আসলে যেমন-তেমন ক'রে থাকি ব'লেই তো বুড়োটে দেখায়? আর লোকে ভাবে বয়েস হ'য়ে গেছে।

সেজন্যেই ভাবছি খান কয়েক রঙিন শাড়ি কিনবো। বয়েস-টয়েস তো আসলে সবই ফাঁকি? সব ছুকরি সেজে থাকে, তাই। নৈলে ঐন্দ্রিলাই যেন কতো বয়েস কম। আহা-হা।'

'রাত্তিরে আপনি কী খান?' আমি প্রসঙ্গটা বদলাবার চেষ্টা করলাম।

'তোরা কী খাস?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মালতীদি।

'ভাত।'

'ভাতের সঙ্গে কী খাস? আজ কী মাছ রেঁধেছিস?'

'আজ মাংস।'

'মাংস!' মালতীদির চোখ দুটো একেবারে চকচক ক'রে উঠলো। 'আজ মাংস, সে তো খুব ভালো কথা। মাংস আমি ভয়ানক ভালোবাসি। আর যদি গ্রাম-ফেড মটন হয়, তা হ'লে তো কথাই নেই। দই আর আস্তো-আস্তো মশলা দিয়ে তার যা রান্না, আঃ। যদি খাসি হয় সেও মন্দ নয়। মশলা মাখিয়ে দিয়ে বিনা জলে কেবল ক'ষে-ক'ষে যদি রাঁধিস, চমৎকার। তাই ব'লে মাছেরও কিছু কম যায় না। ধর গিয়ে বড়ো পোনার পেটি, চেতল মাছের পেটি, আড় মাছের ল্যাজা, সে কি সোজা নাকি? আর তেল-কই? চাটালো-চাটালো কাজলের মতো কৈ এনে তুই যদি মটরশুঁটি আর পেঁয়াজবাঁটা দিয়ে রাঁধিস তাহ'লে আর দেখতে হবে না। শোন, এক কাজ কর, আমাকে রাত্তিরের খাবারটা এখুনি দিয়ে দে। বুঝলি না? শরীর তো ভালো না, দেরি করলে হজম হবে না শেষে।

স্তিমিত গলায় বললাম, 'হাত মুখ ধোবেন না? ট্রেন থেকে এলেন।'

'হাত-মুখ? ধোবো'খন। একেবারে খেয়ে উঠেই ধোবো।' কী আর বলবো। উঠে গিয়ে খাবার সাজিয়ে দিলাম টেবিলে। চায়ের সঙ্গে যা দিয়েছিলাম স্বাভাবিক অবস্থায় মালতীদি তা দেখলেও মূর্ছা যেতেন, আর তারপরেই ভাত খেতে বসা! কিন্তু মালতীদি খেলেন। খুব পরিপাটি ক'রেই খেলেন। খেতে-খেতে যে কী বললেন আর না বললেন কোনো কথাই কানে গেলো না আমার। আমার মন কোথায় কত দূরে ঢাকা শহরের রমনা পাড়ার একটি ছোট্ট বাড়িতে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগলো। খাওয়া বিষয়ে উদাসীনতা, আর তার চেয়েও বেশি অহেতুক লজ্জা মালতীদির চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিলো। এই নিয়ে আমরা তাঁকে কতো ঠাট্টা করেছি।

মাসিমা (মঞ্জুশ্রীর মা) বলেছেন, 'জানিস না বুঝি? ও যে আর জন্মে গন্ধর্বদের মেয়ে ছিলো। সেখানে নীল সরোবরে লাল পদ্মের নৌকোয় ব'সে হালকা শরীরে চাঁদের মতো হালকা রঙের শাড়ি প'রে ফুরফুরে বাতাসে বীণা বাজিয়ে বেড়াতো। সেখানে তো কেউ খায় না, কেবল দিবস-অন্তে সোনার গাছে হিরের ফলের দিকে মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকায়।'

আমরা হাসতাম। পাশাপাশি খেতে ব'সে নরম হাতে কাঁটা-চামচেটি দিয়ে এইটুকু আতপ চালের এক চামচে ভাতের সঙ্গে একটু মাখন, একটু আলুসেদ্ধ, সামান্য একটু তরকারি দিয়ে খাওয়া সাঙ্গ ক'রে লাজুক মুখে মালতীদিও হাসতেন। মাছ মাংসে গন্ধ পেতেন তিনি, খেতে পারতেন না। তাই নিয়ে তাঁর কুণ্ঠার অন্ত ছিলো না। মালতীদির চোখে মুখে চেহারায়, গায়ের অসাধারণ পাৎলা চামড়ায়, সরলতায়, কোমলতায়, চোখের দৃষ্টির সুদূরতায় সত্যি যেন এই ধুলোমাটির পৃথিবীর ছাপ ছিলো না কোনো। সেই মালতীদিকেই আমার মনে পড়তে লাগলো বারে-বারে। বারে-বারে এই মালতীদি ঝাপসা হ'য়ে যেতে লাগলো আমার চোখে।

সেই রাতটা ছিলেন মালতীদি। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। কখন যে গেলেন বলতেও পারলো না কেউ। আর তারপর কাল। কাল আবার দেখলুম মালতীদিকে।

ভাগ্য। সবই ভাগ্য। এতোদিনে মনে হ'লো ভাগ্যের বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই মানুষের। ধর্ম মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, বিবেক মিথ্যা, সব মিথ্যা। ভাগ্যই একমাত্র পরম সত্য। এতোকাল ধ'রে গল্পে উপন্যাসে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের যতো কাহিনী শুনেছি, কোনোটাই তার অসত্য নয়। ভাগ্য যাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

সুবীর বললো, 'মামী, কী ভাবছো?'

মুখ তুলে তাকিয়ে বললাম, 'জানি না।'

'মন-খারাপ করছে?'

এ-কথা শুনে কলকাতা শহরটা যেন বৃষ্টিভেজা মেঘে মোছা একটা বোবা রাত্রির মতো আবছা হ'য়ে গেলো আমার চোখে। টের পাইনি কখন দপ ক'রে আলো জ্ব'লে উঠেছে, উল্লাসে নেচে উঠেছে চৌরঙ্গি পাড়ার রাস্তা, দোকান, অলিগলি সব। অনেকক্ষণ পরে হীরার দ্যুতির মতো সেই উজ্জ্বল আলোয় দূরে

তাকিয়ে দেখলাম মালতীদির কম্বলমোড়া ছায়ামূর্তিটাকে কে যেন ফেরাজিনির দরজা থেকে জোরে ঠেলে দিলে। কনুইয়ে ভর ক'রে মুখ থুবড়ে মালতীদি ঝপ ক'রে একটা বস্তার মতো প'ড়ে গেলেন ওদের টব-সাজানো আধখানা সিঁড়িতে। পোষাক-আঁটা দরোয়ান পায়ের ঠোক্করে সেই আধখানা দেহকে সম্পূর্ণভাবে ফুটপাতে ঠেলে দিয়ে সেলিউট ক'রে স্প্রিং-আঁটা হাফ-ডোর মেলে ধ'রে স'রে দাঁড়ালো। একজোড়া শাদা পায়রার মতো আলিঙ্গনাবদ্ধ এক-জোড়া সাহেব-মেম কলহাস্যে ঢুকে গেল ভেতরে।

উদয়াস্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পরাধীন দেশ উদারনীতির শ্রীক্ষেত্র; এবং তীর্থের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ যেহেতু সনাতন, তাই মনস্তত্ত্ব স্থানমাহাত্ম্য না মেনে বলে যে নির্জিত মানুষের মুক্তিমন্ত্র অবদমিত আত্মস্তরিতার নামান্তর—অন্তত তার মূলে নিষ্কাম আদর্শের প্রেরণা নেই। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ, সাধারণ্যে আস্থাবান। কাজেই আমার কাছে মনোবিকলনের সিদ্ধান্ত প্রায়ই অবিশ্বাস্য ঠেকে; সন্দেহ হয় বৈজ্ঞানিক আভিজাত্যের অভাবেই হয়তো এই অকুলীন বিদ্যা কালাপাহাড়ের পদাঙ্কে চলেছে। কিন্তু আত্মপ্রসাদকে সব সময়ে প্রতর্কের আড়ালে আগলে রাখা যায় না; এবং সংশয়ের বেড়া এক বার ডিঙালে, সমর্থন একেবারে অসীমে পৌঁছায়। ফলত কয়েক বছর আগে আমাদের প্রগতিবিলাসী বুদ্ধিজীবীদের মুখে অস্‌ভাল্ড্‌ স্পেংলার-এর গুণ-কীর্তন শুনে য়ুং-কথিত সামবায়িক অচৈতন্যে আমার শ্রদ্ধা বাড়েনি বটে, কিন্তু দুধের অনটন যখন ঘোলেও মেটে না, তখন জাতিরা যে ব্যক্তির মতোই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙে, সে-সম্বন্ধে দ্বিধা ঘুচেছিল। অবশ্য সে-দিন আজ অতীত; সাম্প্রতিক জনসেবকেরা আর উদাসীন রাজপুরুষদের সামনে অন্তদেশের অমোঘ অধঃপতনের বিভীষিকা আঁকতে ব্যস্ত নন, মার্ক্‌স্‌-সংহিতার পাঠোদ্ধারে শাসকসম্প্রদায়ের কাণ্ডজ্ঞান-হরণেই এখন তাঁরা বদ্ধপরিকর। তাহলেও এই রুচিপরিবর্তনে আমি সান্ত্বনা পাই না, বরঞ্চ প্রমাদ গণি। কেননা ভারতভূমিতে জন্মেও আমি স্বভাবত স্বতোবিরোধী ব্রহ্মসাযুজ্যে বঞ্চিত; এবং আর পাঁচ জনের মতোই আমার পক্ষে অসঙ্গতির অস্বীকার যদিও অসাধ্য, তবু হাওয়াবদল যে হেতুবাদের সপত্ন নয়, তা আমি জানি।

সেই জন্যে আজ আমি প্রায় নিঃসন্দেহ যে মার্ক্‌স্‌ বা স্পেংলার-এর মর্যাদা-ঘাটনে ভারতবাসী নিরাগ্রহ, তাঁদের কথামৃতে আমরা কেবল এই আশ্বাস খুঁজি যে আমরা তো গেছিই, আমাদের হর্তা-কর্তারাও আর বেশী দিন নেই। অর্থাৎ পশ্চিমের উপক্ষয় আর প্রোলেটেরিয়েট্‌-এর অভ্যুদয়, উভয় উপনিপাতের

সাহায্যে আমাদের উপস্থিত অক্ষমতার জ্বালা জুড়ায় ব'লেই, ভারতীয় চরম পন্থায় মার্ক্‌স্‌-স্পেংলার-এর একত্র সমাবেশ শোভন ও সম্ভব। তবে বর্তমান মন্তব্যে স্পেংলারী বিসংবাদের সাক্ষ্য খোঁজা ভুল; এবং প্রাচ্য জাতিসমূহের দৈন্যগ্রন্থিই উক্ত মনীষিদ্বয়ের একমাত্র যোগসূত্র নয়, এখানকার রাজনৈতিক দুর্গতির অন্য প্রতিকার থাকলেও, আপাতত তাঁদের সমপাঙ্‌ক্তেয় লাগত। কারণ অদৃষ্টবাদ আর আত্মবিশ্বাসের আতিশয্যেই তাঁরা হরিহরাত্মা নন, আশু ভবিষ্যতের সমাজ-সম্বন্ধেও দু জনের পরিকল্পনা ভয়াবহ রকমের এক। সে-সমাজ পিপীলিকাধর্মী: তাতে ব্যক্তিবৈচিত্র্যের অবকাশ নেই, স্তরভেদের সুযোগ নেই; ভৌগোলিক পরিস্থিতি তার ভাগ্যবিধাতা; এবং পরিণামী যন্ত্রশিল্পের নিষ্ঠুর নিয়মে তার গতিবিধি চিরকালের মতো নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে সে-দুর্দশা শুধু জনসাধারণের ভোগ্য নয়, যে-স্বেচ্ছাচারী লোকনায়কেরা সেই ক্রীতদাসী সাম্যের অধিষ্ঠাতা, তারা শুদ্ধ যদৃচ্ছার বাহন তথা ঘটনাচক্রের ফল। অতএব সেই স্বৈরী যুগাবতারেরা জগৎ জুড়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবে, লুঠ-তরাজে নাগরিক সভ্যতাকে উৎসন্নে পাঠাবে, মানুষকে অনিকাম পশু-পক্ষীর সমান মাটির অধিকারে ফিরিয়ে আনবে; কিন্তু কারও চেষ্টাতে বিধ্বস্ত সমাজে প্রাগৈতিহাসিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

কেননা মানুষী সঙ্কল্প মায়া-মরীচিকার চেয়েও অসার; কারুকলা দূরের কথা, অস্ত্রীক্ষার মতো নিরপেক্ষ শাস্ত্রও কালধর্মেরই অভিব্যক্তি; এবং তথা-কথিত নির্বাচনশক্তির ব্যবহারে আমরা আমাদের অবস্থান্তর ঠেকাতে পারি না, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ববিধানের পথই পরিষ্কার করি। সংক্ষেপে, মার্ক্‌স্‌ আর স্পেংলার দু জনেই জড়বাদী ও প্রজ্ঞাবিমুখ; এবং জন্মসময়ের পার্থক্য-বশত প্রথম প্রবক্তার হেতু-প্রত্যয় যদিও শেষোক্তের জ্যোতিষে এন্টোপি-র আকার ধরেছে তবু স্থানে-অস্থানে বিজ্ঞান-শব্দের অপপ্রয়োগে উভয়ের মহামূল্য রচনাবলী দুষ্পাচ্য ও দুষ্পাঠ্য। কিন্তু তাঁদের সৌসাদৃশ্য এই পর্যন্তই; এবং যিহুদি বংশে জন্মেও মার্ক্‌স্‌ শুভবাদী, আর নিজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্পেংলারী দূরদৃষ্টিতে হিব্রুসুলভ নৈরাশ্যই সুপ্রকট। তবে সে-জন্যে বিস্ময়প্রকাশ অনুচিত: অনেকের মতে সংঘর্ষমাত্রেই ঐক্যসূচক; এবং নর্ডিক্‌ জার্মানি যেহেতু সেমিটিক্‌ পরশ্রী-কাতরতারই উত্তরাধিকারী, তাই সে-বৃত জাতি জার্মানদের অসহ্য। উপরন্তু স্বকীয়তা আর স্বতঃসঙ্গতি কখনও একাধারে ধরা দেয়নি; এবং আর্য দার্শনিক

স্পেংলার আজীবন আপন তালে চললেও, গন্তব্যে পৌঁছে আর একজন যিহুদি ভাবুকেরই কুসঙ্গে পড়েছেন। সে-ব্যক্তি ফ্রয়েড্‌; এবং তাঁর অতিজটিল মনস্তত্ত্ব যে-মৌল মুমূর্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রাথমিক জাড্য, সেই আদিম ইনশিয়া-ই বোধহয় স্পেংলারী তত্ত্বজিজ্ঞাসারও ভিত্তি। অগত্যা অচির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁর ও মার্ক্‌স্‌-এর মধ্যে খুব বেশী মতদ্বৈত না থাক, শেষ অবধি তাঁরা একেবারে বিপরীত; এবং আগামী খণ্ডপ্রলয়ের উপসংহারে মার্ক্‌স্‌ যেখানে খুঁজে পেয়েছেন মৈত্রীময় স্বর্গরাজ্য, স্পেংলার সেখানে প্রত্যক্ষ করেছেন ভূতবিদ্যাবর্ণিত "তাপমৃত্যু"।

ইতিমধ্যে মার্ক্‌স্‌ সমন্বয়সাধক ডায়ালেক্‌টিক্‌-এর ভক্ত, পরিণামী কৈবল্যে নিষ্ঠাবান; এবং স্পেংলার অবিকল মনাড্‌-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, কালাবর্ত-জাত বুদ্‌বুদপরম্পরার বিচ্ছেদ-প্রমাণে যত্নপরায়ণ। অতএব ন্যায়শাস্ত্রের উপরে কোনও পক্ষের বিশেষ আস্থা নেই; এবং ভাষ্যকারের জীবনেতিহাস যেকালে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার তোয়াক্কা রাখে না, তখন জাতিসমূহের ঐকান্তিক কর্মঠবৃত্তি স্পেংলারী সর্বজ্ঞতার অন্তরায় নয়। কিন্তু সত্য যে এক ও অদ্বিতীয়, এ-মতপোষণের সময় এখনও আসেনি; এবং ব্যক্তিক্রমই নিয়মের প্রাণ না হোক, অন্তত অপরিহার্য লক্ষণ বটে। সুতরাং এ-উভয়সঙ্কটে পক্ষ-পাতপ্রদর্শন মারাত্মক; তার চেয়ে বরঞ্চ এই মীমাংসা স্বীকার্য যে যাথার্থ্য মধ্য-পন্থার পথিক; এবং পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের একটা অন্যের সর্বনাশ সাধে না, সম্পূর্ণতা আনে। তাছাড়া অকাল মৃত্যুর অত্যাচারে স্পেংলারী চিন্তাধারার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় আজ শুধুস্বপ্নেয়; এবং এতে যদি অচই সন্দেহ নেই যে তাঁর শেষ পুস্তক "দি আওয়ার অফ্‌ ডিসিশন্‌" নাৎসী নিগ্রহনীতিরই পরিপোষক, তবু রাজনৈতিক সংক্রামে তত্ত্ববিচার একেবারে মরে না ব'লেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। অবশ্য স্পেংলার নিজে এ-ধারণার প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু হেগেল্‌-এর সাক্ষ্য তাঁর বিরুদ্ধে; এবং সেই রক্ষণশীলের তর্কবিদ্যা যেমন বামাচারী বিপ্লবী-দের বীজমন্ত্র, তেমনই তাঁর সমসাময়িক ও সহধর্মী, স্বাধীনতাসেবী ফিশ্‌টে-ই নাকি ফাশিস্ট্‌দের দীক্ষাগুরু। সম্ভবত সেই জন্যে দর্শনের নামে কৃতকর্মাদের মুখে হাসি ফোটে; এবং অজ্ঞাতসারে হিউম্‌-প্রভৃতি দার্শনিকদের প্রতিধ্বনি ক'রেই তারা চড়া গলায় রটায় যে পরাবিদ্যা বুড়ো বয়সের ছেলেখেলা।

তাহলেও; দর্শন আছে, কেবল এই অভিমতে পৌঁছানোর জন্যে দর্শনালোচনা

আবশ্যক নয়, দর্শন নেই, এ-অনুমানও দর্শনসাপেক্ষ; এবং তথ্যবিমুখ তত্ত্ব যদিও উপহাস্য, তবু তত্ত্ববিরহিত তথ্য নিরুপাখ্য। অতএব স্পেংলার-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তির কোনও মানে নেই যে তাঁর স্বাভাবিক মতিগতি তাঁকে যে-বিশ্ববীক্ষার অন্তর্বর্তী করেছে, তাতে তথ্যমাত্রেই বিকারগ্রস্ত। কারণ অনুরূপ অভিযোগ তো সকল ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে খাটেই, এমনকি অতগুলি তথ্যের অমন সামঞ্জস্যসিদ্ধি যেহেতু অন্যত্র বিরল, তাই গ্রন্থখানির শত দোষ সত্ত্বেও "দি ডিক্লাইন্ অফ্ দি ওয়েস্ট"-এর অনাদর হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা। এ-প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আর্নল্ড্ টয়েন্‌বি-র তুলনা অবান্তর নয়; এবং স্পেংলারী অবজ্ঞেদবাদের খণ্ডনে টয়েন্‌বি দ গোবিনো, এডুয়ার্ড্ মেইয়ার, গিল্‌বর্ট্ মারে ইত্যাদির পৃষ্টপোষণে যে-সেতুবন্ধনির্মাণে অগ্রসর, তাতে ইংরাজদের ভাবালু উদারনীতির হস্তাক্ষর যতই স্পষ্ট দেখাক না কেন, তথ্য ও তত্ত্বের নির্বন্ধ হয়তো আরও দুর্ঘট। অবশ্য বিভিন্ন দেশ-কালের পৃথক পৃথক সংস্কৃতির মধ্যে এক ও অবিভাজ্য মানবজাতির ক্রমবিকাশ খুঁজলে, বিশেষ কোনও পক্ষপাত ধরা পড়ে না, বরং জাত্যভিমানের প্রত্যাহারই প্রকাশ পায়; এবং এ-দিক থেকে টয়েন্‌বি যেমন প্রশংসনীয়, পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যের প্রচারক ফিশার-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তেমনই নিন্দাভাজন। তথাচ দার্শনিকের কাছে এ-নিরাসক্তির বিশুদ্ধি তর্কাতীত নয়; এবং এর সাহায্যে মনুষ্যজাতির প্রতিপত্তি সুপরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিজস্ব নিপাতে যায়, বিবর্তন আর লীলার সীমা-সন্ধি মোছে, সম্পর্কের বালাই ঘুচিয়ে ব্যক্তি অ্যারিষ্টটেলীয় ভগবানের পাশে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তিবাদের কোনও সার্থকতা থাকে না।

কারণ এ-কথা যতই নিশ্চিত হোক না কেন যে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যেহেতু একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ আছে, তাই পারিপার্শ্বিক বদলালে মানুষও অগত্যা বদলায়, তবু সমাজের পরিবর্তনে যদি প্রতিবেশের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে, তবে শুধু ভাবী স্থিতিস্থাপনের প্রবর্তনা চোকে না, সেই সঙ্গে বস্তুজগতের অস্তিত্বও শূন্যে মেশে। আমার বিবেচনায় মার্ক্‌স্-এর মতো সূক্ষ্মদর্শী প্রগতিসাধক এই প্রাথমিক ভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেননি; এবং তৎসত্ত্বেও তাঁর সাবধান জড়বাদ শেষ পর্যন্ত বাক্তি-প্রস্তাবিত অবরোধপ্রথার অন্তরালে আত্মগোপন না করুক, অন্তত কাণ্ট্-কীর্তিত অনির্বচনীয়তায় তলিয়ে গেছে। অর্থাৎ এখানেও বিষয়ী বিষয়কে নিরুপাধিক জেনে নিজেই বিশ্বস্তর-পদবী

নিয়েছে; এবং এর ফলে প্রমিতি তো মনস্কামসিদ্ধির শাসন মেনেছেই, এমন-কি লোকায়ত সুদ্ধ লোকোত্তরে দিশা হারিয়েছে। কেননা যে-জীব বাইরের খেয়ে বাঁচে, পরিপাকের পূর্বেই সে নিশ্চয় খাদ্যসচেতন; নচেৎ সে যেমন অনাহারে মরতে বাধ্য, তেমনই মৃত্যুর সন্নিকর্ষও কোনও দিন বোঝে না। আসলে প্রগতির প্রথম পুরোধা হেগেল্ এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন; এবং বাস্তব ও বোধ্যতাকে তুল্যমূল্য ভাবার দরুন তাঁর মতে ভূমাই সত্য আর সংসার সত্যাভাস বটে, কিন্তু তাঁর কাছে নির্গুণ সত্তা যেকালে অসদেরই সমান এবং ডায়ালেক্‌টিক্ প্রসর্পণ জ্ঞানার্জনের অন্যতম উপায়, তখন জগৎপ্রপঞ্চকে তিনি আবশ্যিক ব'লেই মানতেন, তিনি জানতেন যে অমৃত বিরাজমান মর্ত্যের সোপানশিখরে।

খুব সম্ভব এই রকম একটা অমরাবতীর সন্ধানেই টয়েন্‌বি-র অভীপ্সাও সঞ্চরণশীল। তথাচ তাঁর বিচারে প্রাকৃতিক প্রভাবের ন্যায় প্রত্যয়ের উন্নয়নও অনির্দিষ্ট; এবং মানুষ আপন ভাগ্যনির্ব্বাচনের ক্ষমতা ধরে। ফলত তিনি শুধুই সভ্যতার আনুপূর্বিকতা দেখিয়েছেন, একাধিক সংস্কৃতির সমকালীন প্রতিযোগও হয়তো প্রমাণ করেছেন, কিন্তু পর্যায়বিশেষের জরা বা মৃত্যুর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অথচ জীবনযাত্রার অনন্ত পথ যে পতন ও অভ্যুদয়ে বন্ধুর, তা সর্ববাদিসম্মত; এবং সমুদয় জাতির স্বতন্ত্র পুরাবৃত্তে সাদৃশ্য ও বৈষম্য যে অন্তত সমানুপাতিক, এ-সম্বন্ধেও বোধহয় কারও সন্দেহ নেই। অবশ্য পদার্থবিজ্ঞান আজ কার্য-কারণের শৃঙ্খল-মুক্ত; এবং কোনও অবস্থার যথাযথ পুনরাবৃত্তি যেহেতু অঘটনীয়ই নয়, অভাবনীয়ও বটে, তাই নির্বিকল্প-ন্যায়ের মতো নিত্য প্রকৃতিও হয়তো একটা আদর্শ, অসাধ্য আদর্শ। পক্ষান্তরে ইতিহাসে গণগণিতের প্রচলন হাস্যকর; এবং কার্যত আমরা হেতুবাদের সমর্থন পাই বা না পাই, নিমিত্তে ভক্তি হারালে, ইতিহাসও রূপকথার ভেক পারবে। আমার বিশ্বাস স্পেংলার-ই এ-রকম মায়াবাদের একমাত্র প্রতিবন্ধক। কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে সভ্যতা হেগেলীয় উল্লম্ফনে অন্বয়ের সোপান পেরিয়ে অখণ্ড ভূমার দিকে অনবরত ছোটে না, তার ঘূর্ণমান আয়ুর কম্বুরেখা তাকে অবশেষে নাস্তিতে বিলীন করে। অর্থাৎ তাঁর বিচারে সভ্যতা ব্যক্তিস্বভাব; তার স্বাস্থ্যও সুপরিমিত; জরা-যৌবন, ক্ষয়-বৃদ্ধি, জন্ম-মৃত্যু, এ-সমস্তই তাকে অর্শায়; এবং এ-কথা কেবল উপমা

নয়, তাঁর মতে এক-একটি সভ্যতাব্যষ্টি আসলে এক-একজন মানুষের মতোই নশ্বর ও সাবকাশ।

তবে সেই অসম্পৃক্ত চক্রগুলো যদিও স্বাবলম্বী, তবু তাদের প্রাণধর্ম বৈশিষ্ট্যবর্জিত ; এবং কোনও সাধিতপূর্ব সাম্যে তাদের অধিকার না থাকলেও, তারা সকলেই একটা নির্বিকার প্রতিমানের অনুবাদক। সেই জন্যে প্রত্যেক সভ্যতার মৌলিক উপকরণ মোটামুটি এক রকম ; প্রত্যেকের বিভিন্ন দশা সকলের মধ্যে অনুক্রমিত ; এবং প্রত্যেকের প্রধান প্রধান সংস্কার অঙ্কশাস্ত্রের মতো, যার তথ্যসমূহ প্রামাণ্য বটে, কিন্তু প্রমাণ-নিরপেক্ষ নয়। উপরন্তু সকল সভ্যতার মুখ্য অবস্থাগুলো শুধু তুল্যমূল্য নয়, অনুরূপ ঘটনাগতিকে যত সব মহাপুরুষ গড়ে ওঠে, তারাও আচারে-ব্যবহারে, এমনকি আকারে-প্রকারে, অভিন্ন ; এবং গ্রীসের অ্যালেক্জাণ্ডর রোমের সীজার-রূপে পূজা পেয়ে আবার ফরাসী নেপোলিয়ন্-এর দেহে অম্লান বদনে আশ্রয় নেয়। সুতরাং স্পেংলার-এর বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্ত সমীচীন যে সভ্যতাও মানুষের মতো পুনরাবৃত্তিপ্রিয় ; এবং মরণই যেহেতু পুনরাবৃত্তির চূড়ান্ত, তাই মানুষ বা সভ্যতা কেউ আজ পর্যন্ত অমৃতনিকেতনের উদাত্ত আহ্বানে কান পাততনি। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যাবর্তনস্পৃহা প্রবৃত্তিঘটিত, ক্রয়েডী অচৈতন্যের ব্যাপার ; এবং সভ্যতা মানবসমষ্টির সম্মিলিত চিৎপ্রকর্ষের নাম। সুতরাং ব্যক্তির বেলায় যে-চালনা প্রবৃত্তি থেকে আসে, সভ্যতার পক্ষে সে-প্রেরণা জন্মায় প্রত্যয়ে ; এবং ব্যক্তি যেমন ক্রমান্বয়ে প্রাক্তন অবস্থা খুঁজতে খুঁজতে শেষ কালে আদিম জাড্যে ফিরে যায়, সভ্যতাও তেমনই কতকগুলো সার্বভৌম প্রত্যয়ের নিষ্কর্ষণ করতে করতে অবশেষে বিষয়বিবিক্ত অনর্থে পৌঁছায়।

তখন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ঘৃতলোভীকে ঋণপরিগ্রহের পরামর্শ যোগায়, প্লেটো-প্রোক্ত ক্ষমা খৃষ্টানসংহারে বাধা দেয় না, স্বাধীন বাণিজ্যের সংরক্ষণে বৃটিশ্ সাম্রাজ্য দিগ্বিজয়ে বেরোয়। কারণ সভ্যতাও ব্যক্তির মতোই অহং-সর্বস্ব ; তার ঐতিহাসিক দৃষ্টি নেই ; সে ভাবে না অন্যদের উপরে তার প্রভাব ছড়াতে পারে ; এবং পূর্ববর্তী ভ্রান্তির পুনরভিনয়ে সেও যে সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছে, এমন সংশয়ের স্থান তার দুঃস্বপ্নে শুদ্ধ নেই। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সতরঞ্চ-খেলার অন্ধ ঘাঁটিমাত্র ; এবং নির্বিকার প্রকৃতি ও আত্মরত

প্রত্যয় এত সমবল যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যেক ক্ষেপেই চালমাৎ অনিবার্য। অবশ্য এটা একটা প্রতীক ; এবং এই চিত্রকল্পের পিছনে কোনও পরমার্থ লুকিয়ে আছে কিনা, সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত সহজ ও সম্ভব-পর। তাছাড়া এ-প্রসঙ্গে স্পেংলার নিজেই হয়তো নিজের মন বোঝেননি : কখনও বা সকল সভ্যতার মধ্যে একই আদর্শের স্বায়ত্তশাসন দেখিয়ে বলেছেন যে এই আদর্শ প্রারম্ভে মানসলোকে জন্মালেও, ক্রমে সমস্ত বস্তুজগৎ গিলে অন্তিমে অজীর্ণ-রোগেই মরে ; আবার সময়ে সময়ে তাঁকে চেনেছে এর বিপরীত সিদ্ধান্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জড়বাদ বা জীববাদ, যে-দিকেই ঝুঁকুন না কেন, তার ফলে তাঁর গভীর গবেষণা, বিরাট্ দৃক্‌শক্তি ও নিষ্প্রমাদ কালজ্ঞানের মূল্য এক তিল কমবে না ; এবং এই তিন দুর্লভ গুণের সংমিশ্রণেও তাঁর যুক্তিজালের নাতিবহুল ফাঁকগুলো ভরবে না বটে, তবু এ-কথা বলার দুঃসাহস অন্তত আমার নেই যে অবিচল ন্যায়নিষ্ঠাই সত্য-মিথ্যার একমাত্র ব্যাবর্তক।

উপরন্তু পুনরাবৃত্তিই ভারতীয় বিশ্বধীক্ষার প্রাণ ; এবং একদা এ-দেশের সন্দেহ ছিল না যে শুধু যুগচতুষ্টয় কেন, যুগাবতারেরা শুদ্ধ কেবলই ঘুরে ঘুরে আসতে বাধ্য। অনেকে আবার এতেও সন্তুষ্ট হতেন না ; এবং ইন্দ্রাদি দেবতা কোন্ ছার, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত তাঁদের মতে যখন অনিত্য, তখন স্পেংলার হয়তো তাঁদের কাছেই শিখেছিলেন যে পুরাণপুরুষ উদ্‌ভাবনার শক্তিতে শোচনীয় রকমের দরিদ্র। অন্ততঃপক্ষে এ-কথা ইতিহাসসম্মত যে হিন্দু ভাবনার সঙ্গে জার্মানির প্রথম পরিচয় আঠারো শতকের মধ্যভাগে ; এবং শোপেন্‌হাউয়ার-এর সময় থেকে সেখানকার একাধিক ভাবুক জ্ঞাতসারেই সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবিত। সুতরাং স্পেংলার-এর চিন্তা-ধারায় আমাকে এতখানি আকৃষ্ট দেখে উভয়ের ধমনীতে আর্যরক্তের উপস্থিতি স্মরণীয় নয় ; এবং শোণিতশুদ্ধির কিংবদন্তী যত না অবিশ্বাস্য, ততোধিক কষ্ট-কল্পনা সেই মনোভাব, যার প্ররোচনায় আমরা আজও না হেসে বলতে পারি যে বর্তমানের বিমান রামায়ণী পুষ্পকরথের নিকৃষ্ট সংস্করণ। আসলে উক্ত আত্মশ্লাঘার মূল জন্মান্তর রহস্যের আশাবাদী ভাষ্যে ; এবং শুধু মহাভারত নয়, রঘুবংশও প্রমাণ করে বটে যে হিন্দুস্থানে ট্র্যাজেডির নিষেধ আর একটা কবি-প্রসিদ্ধি, তবু বোধহয় বৈনাশিক ছাড়া অন্য কোনও সম্প্রদায় কর্মফল ও

অধঃপাতের সহযোগ ঘুচিয়ে, বৃত্তিকে শূন্যে তাড়িয়ে বেড়াননি। সেই জন্যে আমি প্রায় নিশ্চিত যে স্পেংলার-এর যথার্থ বক্তব্য একবার বুঝলে, আমরা কখনও ভুলে তাঁর নাম নেব না ; এবং ইতিমধ্যে আমরা যদি ভাবি যে তাঁর লেখায় কালের যে-চক্রান্ত ব্যক্ত, তার প্রশ্রয়ে কালনেমীর লঙ্কাভাগ সম্ভব, তাহলে জানব আমাদের কপালে আরও দুর্দশা আছে। কেননা স্পেংলার-এর তত্ত্বে যা যায়, তা একেবারে যায় ; এবং যা থাকে, তার মৃত্যু যেমন অমোঘ, তার অবচ্ছেদ তেমনই দুস্তর।

অর্থাৎ বনগাঁয়ের শিয়ালরাজারাই স্পেংলার-এর মূল প্রতিপাদ্যে আরাম পাবেন ; এবং পশ্চিমের অস্ত আর প্রাচ্যের উদয় যে এক নয়, তার প্রমাণ খুঁজতে ভারতীয় ভাবলোকের অন্তরঙ্গ পরিচয় অনাবশ্যক। কারণ কিছু কাল আগে কলিকাতা দর্শন পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এক নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যে জুটেছিল ; এবং যেহেতু শুনেছিলুম যে সে-অনুষ্ঠানে সনাতন সমস্যা-সমূহের চর্বিতচর্বণ বন্ধ রেখে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহকর্মী ও সহধর্মীরা তাঁর সত্তর বৎসর-ব্যাপী জ্ঞানসাধনার ঐক্যসূত্র ধরিয়ে দেবেন, তাই দার্শনিক না হয়েও সে-সম্মেলনে ভীড় বাড়াবার লোভ আমি সামলাতে পারিনি। দুঃখের সঙ্গে মানছি যে সে-দিন আশাকে আবার কুহকিনী ব'লে চিনেছি ; এবং ওজস্বিনী বক্তৃতার অনন্ত বন্যায় বারংবার তলিয়ে গিয়ে যদিও নিঃসন্দেহে জেনেছি যে আচার্যদেবের সকল শিষ্যই বিদ্যা-বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, তবু সেই ধুরন্ধরদের আলোচ্য বস্তু, ব্রজেন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, আলোচনার পূর্বে যে-তিমিরে ছিল, এখনও সেই তিমিরে সমাচ্ছন্ন। অবশ্য আমার মূঢ়তার দায় সেই কৃতকর্মদের উপরে চাপানো অনুচিত : ক্ষুদ্র বুদ্ধি-বশত আমি প্রায়ই বাগ্-বিস্তারের মর্ম হারিয়ে ফেলি ; এবং পরে যখন ভাববার অবকাশ মেলে, তখন দেখি যে প্রথমে যে-কথাকে নিরর্থক লাগে, ক্রমশ প্রকাশ পায় তারই অর্থ-গৌরব। উক্ত ক্ষেত্রেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি : স্মৃতিতে সে-সভার কার্যাবলী অশোভন ঠেকলেও, তার আত্মজৈবনিক বাক্যচ্ছটায় এখন আর আমি অভিভূত নেই ; এবং অনেক অনুচিন্তার পরে আজ স্পষ্টই বুঝেছি যে দার্শনিকদের গুরুভক্তি স্বপ্রাধান্যের ছদ্মবেশেই লোকসমক্ষে আসে।

অথবা প্রাচ্য দর্শনের একীভাব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত পণ্ডিত-বর্গ নিজেদের বিজ্ঞাপনে গুরুকে বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছিলেন ; এবং শতমুখ

আত্মপ্রসাদের মধ্যেও তাঁরা আচার্যদেবের নাম নিতে ভোলেনি ; এমনকি প্রত্যেকে নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে মেনেছিলেন যে ভারতীভাণ্ডারের বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যাপনা বা সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী ফল। দুর্ভাগ্যক্রমে এ-প্রশস্তি যতখানি সুশ্রাব্য, সে-পরিমাণে মূল্যবান নয় ; এবং নাটকের সূত্রধার অপরিহার্য বটে, তবু দর্শক স্বভাবত কুশী-লবদেরই মনে রাখে। অবশ্য স্মৃতি-বিস্মৃতির অনেকখানি দৈবাধীন ; এবং লোকযাত্রার পিচ্ছিল পথে অধিকাংশ মহাপুরুষের পদরেখা ইদানীং দুর্নিরীক্ষ্য। বিশেষত যাঁরা দিশারী, কোনও লক্ষ্যে পৌঁছাননি, শুধু সম্ভাবনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁরা হয়তো ঐতিহাসিক মানুষ নন ; এবং ঋণকুণ্ঠ সংসার তাঁদের ধার শুধেছে পুরাণের যাদুঘর-নির্মাণে। কিন্তু সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় নিয়ামকেরা শত সহস্র বৎসর পূর্বে ইহলোক ছেড়েছেন ; এবং ব্রজেন্দ্রনাথ আজও জীবিত—এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে বাণীলোভী ভারতবাসীর প্রত্যাশা মেটেনি। সুতরাং যখন দেখলুম যে সমবেত মনীষীরা ইতিমধ্যেই তাঁর উত্তরাধিকারে ভাগ বসাতে ব্যস্ত, তখন আমি না ভেবে পারিনি যে ব্যাপারটা অবিচার তো বটেই, অত্যাচারও কম নয়। আসলে বিদ্যানুরাগ যতই প্রগাঢ় হোক না কেন, কেবল পাণ্ডিত্য সর্বত্রই উপহাস্য ; এবং তর্কের খাতিরে যদি ধ'রে নিই যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যতীত অন্য কোনও আখ্যা ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাপ্য নয়, তবে তাঁর গুণমুগ্ধ গত তিন পুরুষের বাঙালীরা যেমন নির্বোধ, তাঁর প্রেরণায় প্রবর্তিত অগণ্য ভাবুকের দলও তেমনই কপোলকল্পনা।

প্রকৃত পক্ষে আচার্যদেব বিদ্যাদিগ্‌গজদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্ব স্তরের লোক ; এবং তাঁর সর্বজ্ঞতা নিশ্চয়ই অবিসংবাদিত, কিন্তু আরও অবিসংবাদিত তাঁর ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে বহু দিন যাবৎ বাঙালী মনীষার প্রতিভূ-কল্প ক'রে রেখেছিল ; এরই কল্যাণে তিনি অসংখ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষণার পাথেয় যুগিয়েছেন ; এবং এরই দৌরাত্ম্যে তাঁর কোনও স্থায়ী অবদান হয়তো মানুষী চিৎপ্রকর্ষে থাকবে না। কারণ অনেকের মতে অহমিকাই ব্যক্তিত্বের পাদপীঠ ; এবং তার সংঘাতে অনুযাত্রের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়ে তাকে জ্ঞানান্বেষণে নামানো গেলেও, স্বতন্ত্র সত্যের সন্দেশ আনে মমত্বমুক্ত নিরাসক্তি। অর্থাৎ ব্যক্তিবাদী ভূমাবাদীর বিধর্মী ; এবং তত্ত্বরচনার জন্যে একটা কোনও নৈর্ব্যক্তিক তন্মাত্রের অখণ্ড উপলব্ধি যেহেতু অত্যাবশ্যক, তাই নীট্‌শে-প্রমুখ

সোহংস্বামীরা দর্শনের অছিলায় কাব্যচর্চাতেই মাতেন, হিউম্-পন্থী যুক্তিসর্বস্বদের আয়ত্তে আসে অলক্ষ্যভেদের ব্রহ্মাস্ত্র। তবে এ-অনুমান অনেকের কাছেই অসঙ্গত ঠেকবে; এবং আর কেউ প্রতিবাদের প্রয়াস না পাক, অন্তত আচার্য-দেবের শিষ্যমণ্ডলী সমস্বরে বলবেন যে নিরহংকার ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু বিনয়-ব্যবহারের জন্যেই বিশ্বাবশ্রুত নন, ভূমানন্দও তাঁর জীবনের আদিম ও অবিকার অনুভূতি। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তাঁদের প্রথম প্রস্তাবের সাক্ষ্য; এবং তাঁদের দ্বিতীয় দাবি যে অনতিরঞ্জিত, তার প্রমাণ শীল মহাশয়ের তরুণ বয়সের অপ্রকাশিত মহাকাব্য "দি কোয়েস্ট্ ইটার্ন্যাল্"।

অধিকন্তু শুনেছি যে ব্রজেন্দ্রনাথ সত্যের যুগে একাধিক বার স্বার্থবলি তো দিয়েইছেন, এমনকি বৈষ্ণবদের খৃষ্টের পদান্তে বসিয়েও তিনি ঐতিহাসিক সততাকে দেশাত্মবোধ-রূপ শনির দশা থেকে বাঁচিয়েছেন। তথাচ আমার বিবেচনায় আচার্যদেব আত্মরত মানুষ; এবং তাঁর চিন্তাজগতের ভিত্তি যদিও একটা বিরাট্ উপলব্ধির উপরে, তবু সে-উপলব্ধি আপাতত আত্মোপলব্ধি—তাতে বোধহয় নৈরাশ্যের বীজ নিহিত নেই। অবশ্য এ-আত্মোপলব্ধিকে দৈনন্দিন আত্মস্তরিতার সমগুণ্ক্তিতে ফেলা হঠকারিতা; কিন্তু সাংসারিক অহংজ্ঞানের মতো দৈন্যবোধের গ্রন্থি থেকেই এরও উৎপত্তি। তবে সে-দৈন্য-বোধে ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের স্থূল হস্তাবলেপ নেই, ঐকপদিক অসম্পূর্ণতা সেখানে জাতীয় আত্মগ্লানিতে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমী ঐতিহ্যের তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির অকিঞ্চিৎকরতাই তার উপলক্ষ; রামমোহনী গৌরতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তার সাফল্য; এবং তার ব্যসন প্রাদেশিক কূপমণ্ডূকত্ব। কারণ রামমোহনের পরবর্তীরা অনেক ঠেকে শিখেছিলেন যে সে-অগ্রদূতের নবা-বিষ্কৃত ভাবরাজ্যে বাঙালীর উপনিবেশ-স্থাপনের উদ্যোগ আদৌ মঙ্গলময় নয়; এবং সে-অঞ্চলের বাসিন্দারা অতীতের অবরোধ এড়িয়েছে বটে, বর্তমানের স্বায়ত্তশাসন তথাচ তাদের হাতে আসেনি। অর্থাৎ তারা এক দাসখত ছিঁড়ে ফেলে আর এক দাসখতে সই দিয়েছে মাত্র, ভিক্ষাজীবিকার বদলে স্বোপার্জনের সামর্থ্য পায়নি। তাই ব্রজেন্দ্রনাথের যুগ স্বাবলম্বনসাধনায় আত্মনিয়োগ করলে; এবং তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁকে নেতৃত্বে ব'রে জিভুবনে খবর পাঠালেন যে পশ্চিমের অমূল্য ধনরত্ন প্রাচ্য কোষাগারেরই লুণ্ঠনাবশেষ।

অচিরেই সাংখ্যে হিন্দু "পজিটিভ্ সায়ান্স"-এর এজাহার বেরোল; কণাদ

অণুবাদী বৈজ্ঞানিকদের গোষ্ঠীপতি হয়ে উঠলেন; এবং যে-নব্যন্যায় নবজাত শিশুর ক্রন্দনকে কর্মবাদের অখণ্ডনীয় প্রমাণ হিসাবে গুণে এসেছে, শোনা গেল পাশ্চাত্য লজিক্ তার সামনে নাকি নিরবধি অধোবদনে থাকবে। উপরন্তু আমরা ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারেই থামলুম না; যে-সর্বনাশা ব্যবকলন ও অমানুষিক সত্যানুরক্তি য়ুরোপীয় বুদ্ধিব্যবসায়ীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, তাতেও তাকে হারানোর আয়োজন চলতে লাগল। বলাই বাহুল্য সেই উত্তেজিত বিদ্রোহের মধ্যে দার্শনিকশোভন প্রশান্তির সুযোগ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথেরও জোটেনি; এবং হয়তো সেই জন্যে তিনি ভেবে দেখেননি যে প্রাচীন আর্যাবর্তে যদি অর্বাচীন অন্তর্দেশের অশরীরী প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই না মেলে, তবে ভারতের নাম-সঙ্কীর্তন যত না লজ্জাকর, তার পুনরুজ্জীবন ততোধিক পণ্ড শ্রম। তবে দৈবকৃপায় সে-অনাসৃষ্টির প্রকোপ সম্প্রতি কমেছে; এবং মানসিক পরিশ্রমের আধিক্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ না ঘটলে, শীল মহাশয় নিশ্চয়ই "নিউ এসেজ্ ইন্ ক্রিটি-সিজ্ম্" অথবা "পজিটিভ্ সায়েন্সেজ্ অফ্ দি এন্শ্রেন্ট্ হিন্দুজ্"-এর অপেক্ষা মহার্ঘ বই একাধিক বার লিখে ফেলতেন। কিন্তু তাহলেও তত্ত্বদর্শনের একটা নূতন সময়য় আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতুম কিনা সন্দেহ; এবং বর্তমান জীবনের অশেষ বৈচিত্র্যই এ-সংশয়ের প্রথম কারণ বটে, তবু ব্রজেন্দ্রসাহিত্যের সর্ববাদিসম্মত দুর্বোধ্যতা, আর পক্ষান্তরে তাঁর অনুষঙ্গপ্রধান চিন্তাপ্রকরণের বিশৃঙ্খলা, এ-জন্যে কিয়দংশে দায়ী।

অবশ্য উক্ত দুরূহতা ও অবচ্ছেদ যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাক্তন অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তাতে হয়তো মতান্তর নেই; এবং তাই তাঁর মনকে আবাল্য পরিণত বলাও সমীচীন। তার মানে এ নয় যে ব্রজেন্দ্রনাথের মতামত জন্মাবধি বদলায়নি: বরং উল্‌টোটাই সত্য; এবং তাঁর কৈশোরিক হেগেল্-ভক্তি বার্ধক্যে স্বভাবতই বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে মিশে গেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন স্বাভাবিক হলেও, অনিবার্য নয়; এর মধ্যে কোনও অকাট্য যুক্তিসূত্রের চিহ্ন মেলে না; এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরে তাঁর অগাধ আস্থাই তাঁকে সমস্ত তুলামূল্য উৎরিয়ে অবাধ নিঃশ্রেয়সের সামনে এনেছে। সুতরাং এই ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে হেগেল্-এর ডায়ালেকটিক্-প্রসূত নির্বিকল্প কৈবল্যের কোনও সম্পর্ক নেই: এ-নিরুপাধিক অনুভূতি অচিন্ত্য; অপবাদ-ন্যায়ের নেতি-নেতিই এর একমাত্র সংজ্ঞা; এবং তত্ত্বদর্শনের উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের

অতিবিশিষ্ট অভিজ্ঞতাকেও সামান্যের অনুবন্ধে বাঁধা, সেই জন্যে ব্রজেন্দ্রনাথদের স্বয়ংসিদ্ধি এ-পর্যন্ত কোনও চিন্তাপরম্পরা গড়তে পারেনি, মরমী প্রত্যুচ্ছ্বাস অন্তরঙ্গদেরই অন্তঃপ্রেরণা যুগিয়েছে। সে-ইষ্টাপত্তিও নিশ্চয় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ; তবে যাঁরা তত্ত্বসমন্বয়ের প্রণেতা তাঁদের ধরণ-ধারণ অন্য রকমের। বুদ্ধি ও ধারাবাহিকতাই সে-প্রতিভার গুণ ; এবং সে-প্রকৃতি মৃথ্যত হেতুপ্রভব। পক্ষান্তরে হেতুবাদে নির্ভর ঘুচিয়েও অধীকার উপরে আস্থা রাখা একেবারে অসাধ্য নয় ; এবং ব্র্যাড্‌লী-বর্ণিত সত্যের স্বরূপে সদসদের নির্দ্বন্দ্ব তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত।

অতএব উপরের মন্তব্যের সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথকে অন্যায় আচরণের জন্যে সনাক্ত করা আমার অনভিপ্রেত। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু আর গণিত-বিলাসী বিপরীত পথের পথিক ; এবং শেষোক্তের শুচিস্নাত নিত্যপদ্ধতি প্রায়ই প্রথমোক্তের ব্যবহারে আসে না। কারণ তথ্যই যদিও সব অনর্থের মূল, তথাচ তথ্যাতীত তত্ত্বের অন্য উপকরণ নেই ; এবং তত্ত্বের বেলা অন্তর্দর্শন আবশ্যিক বটে, তবু ভূয়োদর্শনও দুরাক্রম্য। এইখানেই সমন্বয়ের প্রয়োজন ; এবং তাত্ত্বিক যখন নিজেকে কোনও নির্বিভাগিক নিয়মের নিমিত্তমাত্র ভেবে পুরুষার্থ আর পরমার্থের দুস্তর ব্যবধানে লজিকের সেতুবন্ধ গড়েন, তখনই তিনি তথাগত, তার আগে পর্যন্ত ব্যাসকূটের পদকর্তা দ্বৈপায়ন। অর্থাৎ আমার মতে ব্রজেন্দ্রসাধনার অন্তর্গূঢ় নিঃসম্পর্কতাই আর্য আদর্শের অমোঘ অভিব্যক্তি ; এবং প্রতিকূল জনশ্রুতি সত্ত্বেও আমি না মেনে পারি না যে আমাদের চিত্তবৃত্তি প্রকৃত ফিলজফির অন্তরায়। অন্ততঃপক্ষে আমাদের কাছে প্রামাণ্য এখনও প্রজ্ঞার অগ্রগণ্য ; এবং সে-প্রামাণ্য আধুনিক কালে আপ্তবাক্যের আঁচল ছেড়ে আত্মবেদের ভেক নিয়ে থাকলেও, যুক্তিকে আমরা জাল ব'লেই জানি। কাজেই বৈনাশিকেরা এ-দেশে তিরস্কার কুড়িয়েছে, প্রাচীর পূজা পেয়েছে ধর্মধ্বজেরা ; তাই হিন্দু দর্শন সার্থক গদ্যে লিপিবদ্ধ হয়নি, সূত্রাকারে অথবা সংক্ষিপ্ত শ্লোকে স্বাধিকারপ্রমত্ত ভাষ্যকারদের প্রশ্রয় দিয়েছে ; এবং সেই জন্যে একই ন্যায়নিষ্ঠার তাগিদে জ্যামিতির গড়া-ভাঙা ভারতীয় কীর্তিকলাপের অন্তর্গত নয়, পাশ্চাত্য ধীশক্তির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কিন্তু বিদেশের আত্মঘাতী বিচারবুদ্ধি বিজ্ঞানের পক্ষেই অপরিত্যাজ্য,

অণুবা

শিল্প নিকষে স্বদেশের আধ্যাত্মিক সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতাও অনুপকারী নয় ; এবং জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অভিধা যেকালে আজ অবধি আলাদাই আছে, তখন এ-ক্ষেত্রে একাগ্রতা নিশ্চয়ই মারাত্মক। বস্তুত ব্যক্তির ন্যায় জাতির মধ্যেও অধিকারভেদ বিদ্যমান ; এবং পশ্চিমের ভাবধারা যেমন অভিব্যাপ্ত স্বতোবিরোধের আবিষ্কারে যুগ-যুগান্ত কাটিয়েছে, পূর্বের ধ্যান-ধারণা তেমনই সেই বিপ্রলাপের পরপারে আবহমান কাল খুঁজেছে অনির্বচনীয় প্রজ্ঞাপারমিতাকে। বিশ্বমানবের ঐশ্বর্য বাড়াতে দুই পরিশীলনই সমান মর্যাদাবান ; এবং এই সত্যকে সর্বাগ্রে অঙ্গীকার করেছিলেন ব'লেই, রামমোহন রায় অবিস্মরণীয়। শুনেছি শীল মহাশয়ও রামমোহনের পরম ভক্ত ; এবং তাঁর অবচেতনায় অনুরূপ মৈত্রীর ঝঙ্কার বেজে থাকুক বা না থাকুক, তাঁর বিস্তর পাণ্ডিত্য যে সঙ্কলনধর্মেরই রূপান্তর, তাতে প্রতর্কের অবকাশ নেই। সুতরাং আজকের বহুধাবিভক্ত সমাজে তাঁর উপস্থিতি অতিশয় বাঞ্ছনীয় ; এবং প্রাচ্য গুরুবাদ যে শুধু স্বার্থসংরক্ষণের জোরে বেঁচে নেই, তার সাক্ষ্য তাঁর মতো মানুষ। কারণ কোষ্ঠীবিচারে তিনি সক্রেটিস-বংশের শেষ কুল-প্রদীপ ; এবং সুসম্বদ্ধ "সিস্‌টেম্"-এর রচনা তাঁর কর্তব্য নয়, প্রতিবেশকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েই তিনি ভারমুক্ত। তাঁর ঐকান্তিক অন্তর্দৃষ্টি জাগতিক বীক্ষায় পর্যবসিত হবে পশ্চাদ্‌গামী প্লেটো-র প্রয়োগে ; এবং সে-প্লেটো-র কণ্ঠস্বর যদি ভারতবাসী আজও শুনতে না পায়, তবে ব্রজেন্দ্রনাথের বিদূষণ সঙ্গত নয়, অপরাধী হয়তো হিন্দু দর্শনের ভাষাগত ঐতিহ্য।

বলাই বাহুল্য যে সংস্কৃতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর নিরক্ষরের বিজাতীয়রাগ প্রায় এক পর্যায়ের ব্যাপার ; এবং বোধহয় সেই জন্যে এ-দেশের প্রাচীন কাব্যে গুণবাচক বিশেষ্যের বিস্ময়কর ব্যবহার আমাকে যেমন মাতিয়ে তোলে, শঙ্করভাষ্যের অনুপম বাক্‌সংযমে আমি তেমনই অপূর্ব উপমা ও অব্যর্থ উৎপ্রেক্ষার নিদর্শন খুঁজি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও আমি ভুলতে পারি না যে সে-কালের শিক্ষায় ব্যাকরণ অধীত হত বারো বছর ধ'রে ; এবং ইদানীন্তন দর্শনশাস্ত্রীদের মধ্যে সে-রকম ব্যুৎপত্তি যদিও বিরল, তবু তাঁরা নিশ্চয়ই দেবভাষার উৎপীড়নে অন্তত ততখানি বিপন্ন, আমরা যে-পরিমাণে ব্যতিব্যস্ত ইংরাজীর দাবিতে। অবশ্য গতানুগতিক বাংলায় নূতন প্রাণের উদ্বোধন শ্বেতদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অবদান ; এবং কেবল মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র নন,

বিদ্যাসাগরও পাশ্চাত্ত্য ভাবসম্পদের অধমর্ণ। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যের সনাতন ধারায় ক্রমবিকাশের আর স্থান নেই বুঝেই তাঁরা জাতীয় চিৎপ্রকর্ষের আমূল পরিবর্তনে মন দিয়েছিলেন ; এবং এখনকার ভারতীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা হয়তো সংস্কৃতের ঐশ্বর্যে এমনই মুগ্ধ যে অন্য কোনও দিকে তাকাবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত তাঁদের নেই। অর্থাৎ ভাব ও ভাষার পৃথক্করণ আজ আমাদের আত্মকৃত্য ; এবং এখানকার কবিতাবিচারে রিচার্ড্‌স্‌-এর মতো সমালোচকের প্রয়োজন থাক বা না থাক, হিন্দু দর্শনের পুনরুদ্ধার তাঁরই সাধ্য, যিনি বিশ্লেষে মূর-এর সমকক্ষ। অন্ততঃপক্ষে এ-জনরব একেবারে অমূলক নয় যে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মতো বিদ্বানও দার্শনিক নন, দর্শনের ঐতিহাসিকমাত্র ; এবং তাঁর প্রসাদগুণ অবশ্যস্বীকার্য বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বিরাট পাণ্ডিত্য সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল বক্তব্যটুকুও বাংলায় বিশদ করতে পারেনি।

এমন মন্তব্য যখন তাঁদের বিষয়ে খাটে, তখন পাশ্চাত্ত্য জগতের তথাকথিত জড়বাদের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষকের তোতাপড়া আশ্চর্যজনক নয় ; এবং তার পরে দর্শনের সার্থকতা কী শুধালে, ছাত্রেরা যদি উত্তরে বলে বৈরাগ্যসঞ্চার, তবে তাদের গুরুমারা বিদ্যা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। অবশ্য শোনা যায় যে তিন বছর কেম্ব্রিজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে দেশে ফেরার সময় এক চৈনিক দার্শনিক নাকি মেনেছিলেন যে নিত্যবৃত্ত বর্তমানে হ-ধাতুর যথাযথ প্রয়োগ প্রায় তাঁর আয়ত্তে এসেছে ; এবং এটা হাসিরই গল্প। কিন্তু অনির্বচনীয়ের প্রশস্তিতে অনর্গল বাক্যব্যয় আরও উপহাস্য ; এবং জীবনে মরমী অভিজ্ঞতার যেমন মূল্যই থাক না কেন, তা নিশ্চয় স্বতঃপ্রমাণ—অর্থাৎ অভিজ্ঞকে দেখবামাত্র আমাদের মধ্যে অনুকরণের ইচ্ছা জাগা উচিত। নচেৎ ঈশোপনিষদ আওড়াতে আওড়াতে কামিনী-কঞ্চনের ধ্যান কখনও আমাদের বিবেকে বাধবে না ; এবং সেই জন্যে দিনের পর দিন গলার আওয়াজ চড়াতে চড়াতে আমরা অম্লান বদনে রটাতে পারব যে প্রাচ্যের সর্বময় সত্ত্বগুণ তামসিক পাশ্চাত্ত্যের স্বপ্নাতীত। অথচ হিন্দুদের গর্ব যে তাদের সমাজ অবৈকল্যের প্রতিমূর্তি, কৈবল্যের অনুবাদ অথবা পূর্ণের অভিব্যক্তি ; এবং সেই সঙ্গে আমরা আবার ভজাতে ছাড়ি না যে যাদের আচার শাস্ত্রসম্মত, তারা গোপনে নাস্তিক কিনা, তা অপরের জিজ্ঞাস্য নয়। আমার বিশ্বাস অনুরূপ যত অনর্থ, সে-সমস্তের মূলে রয়েছে

আমাদের পরাবিদ্যায় যুক্তির অভাব ; এবং হাজার বছরের নিরন্তর দুর্দশাও যেহেতু আমাদের শেখায়নি যে উপায় ও উদ্দেশ্যের সমীকরণ ভিন্ন সুস্থ সংসারযাত্রা অসম্ভব, তাই ভারতীয় মনীষীদের জানিয়ে লাভ নেই যে পশ্চিম অধঃপাতে গেলে, পূর্বের পুনরুত্থান অনিবার্য নয়, বরঞ্চ মানবসভ্যতার সমূহ বিপদ।

[১৯৩৭]

যামিনী রায়ের গ্রাম

নরেশ গুহ

বাঁকুড়ার শহর পেরিয়ে নদী, রেললাইনপাতা পুল, এগিয়ে গেলে দুধারের শুকনো মাঠ, ভূমি কর্কশ, হঠাৎ ভয়ানক একলা দেখতে খড়ে ছাওয়া মেটে বাড়ি, বাঁশঝাড়, গোরুবাছুর, কৃপণ ডাঙায় মনোযোগী ছাগল চরছে, উলঙ্গ শিশুরা ট্রেন দেখতে ছুটে এলো। আকারপ্রকারে পাল্কীগাড়ির যোগ্য ট্রেনের এক কামরায় তিন কামরা যাত্রী তাদের লটবহর ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে চলেছেন। উইনকার্নিসের বোতলভরা একজনদের পবিত্র গঙ্গাজল এই ভিড়ের মধ্যে উল্টে পড়লো। অনেকটা যেন যামিনী রায়ের প্রসাধনরতা রমণী মূর্তির মতো দেখতে একটি মেয়ে, চমৎকার স্বাস্থ্য, তেমনি গড়ন, তেমনি নাকচোখের টান, গ্রীবার ভঙ্গী, হাঁটুমুড়ে বসা,—ছোটো এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই ফেরিঅলা ডেকে বাংলাফিল্মের জর্ণাল কিনে নিলে, তারপর ভোরের রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ব'সে গাড়ির ভিড় থেকে একেবারে মুছে গেল মেয়েটি। এঞ্জিনের কয়লাগুঁড়ো এড়িয়ে জানালায় পেতে রাখা আমাদের বন্ধু এডোয়ার্ডের চোখে স্বর্গের আলো এসে লেগেছে। স্বর্গের, কিংবা মাঠের ওপারকার গাছপালা ভেদ করে আশ্বিনের লাল সূর্যের বাঙালী আলো। আমি ভাবছি—প্রসাধনরতা রমণীমূর্তির সেই মাধুর্য আঁকায় আজ আর যামিনী রায়ের উৎসাহ নেই কেন। উত্তর কি আমার চোখের সামনে ঐ বাংলা ফিল্মের জর্ণাল খুলে নায়কের ধ্যান করছে ব'সে? ততক্ষণে গাড়ি বেলেতোড় পৌঁছে গেল, যেখানে যামিনী রায়ের গ্রাম, পিতৃপিতামহের বাসভূমি।

শুনেছিলাম প্রকাণ্ড গ্রাম, কিন্তু এতো প্রকাণ্ড ভাবিনি। শহর বললেই বা ক্ষতি কী। বিজলি আলোর উঁচু উঁচু থাম বসেছে মাটির দেয়াল ঘেঁসে, ধানকলের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে একটু একটু, চওড়া চওড়া রাস্তা পিচঢালা, চায়ের দোকানে রেডিও, শাড়ির দোকানে মিলের ঢাকাই, মনিহারি দোকানে টিনের দুধ; বড় বড় আয়না টাঙানো, চেয়ার পাতা দাড়ি কামাবার সেলুন, টেলিগ্রাফের আপিস, হাসপাতাল, মাল্টিপারপাস ইস্কুল খোলবার

উদ্যোগ আয়োজন, দুতিনতলা ইঁচু পাকাবাড়ির সংখ্যা হাতের আঙুল ছাপিয়ে যায়, লোকসংখ্যা দশহাজার। বিষণ্ণ সুন্দর গ্রাম, শীতসায়াহ্নের রোদ্দুরের মতো বিষণ্ণ। বিশেষ ক'রে পাড়ায় পাড়ায় যখন পূজোর বাদ্য বেজে উঠলো, নতুন জামা চড়িয়ে ছেলেমেয়ের খুশিভরা দল ভিড় করতে গেল পূজোবাড়ির উঠোনে, আর আমরা ইঁদারার তোলা জলে স্নান সেরে গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর জাজিম পেতে এখানকার বিখ্যাত মিষ্টান্ন সহযোগে চা খেতে বসলুম। মুর্গির মাংসের খোঁজে গেলেন পটলবাবু।

শহরের খানিকটা সুখ, গাঁয়ের খানিকটা শান্তি—দুই নিয়ে বেলেতোড়। খবর করলে সাপুড়েরা গোখরো সাপের ঝুলি নিয়ে চলে আসে, আটআনা দক্ষিণায় বাউলরা তিনঘণ্টা গান শুনিয়ে যায়—এডোয়ার্ডের আফসোস টেপ রেকর্ডার সঙ্গে আনেনি,—অল্পের জন্য সাঁওতালদের ডাকিয়ে নাচের আয়োজন করা গেল না। বিরাট এক একটা গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে বাউড়ি পাড়ার ভক্তেরা দানা, মাদানা ইত্যাদি সব জাগ্রত দেবতার নামে মাটির হাতি, মাটির ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে গেছে। ফোক্‌আর্টের খদ্দের হলে হাত নিশপিশ করবে—এমনই সব তাদের গড়ন।

এই গ্রামে যামিনী রায়ের জন্ম। তখনো এদিককার রেললাইন বসেনি। লাইন তো বসল সেদিন, ১৯১৮ সালে, যার ফলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হ'য়ে গিয়েছিল ম্যালেরিয়ায়। তার আগে বাঁকুড়া পর্যন্ত গোরুর গাড়ি, বাঁকুড়া থেকে কলকাতার ট্রেন। পায়ে হেঁটেও শহরে যেতেন অনেকে। ঐ গ্রাম থেকেই যামিনী রায় কলকাতার আর্ট-ইস্কুলে পড়তে এসেছিলেন একদিন। এসেছিলেন, ঐপর্যন্ত। পাশও করেননি, সার্টিফিকেটও নেননি। পৃথিবীর শিল্পী সমাজে যে-ধাঁচের ছবি এঁকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার সঙ্গে আর্টস্কুলের শিক্ষার যোগ নামমাত্র।

অনেককে বলতে শুনেছি যামিনী রায় নাকি লুপ্তপ্রায় গ্রাম্য শিল্পেরই একটি ধারাকে শহরে টেনে নিয়ে এসে মনোরম সরোবর রচনা করেছেন; গ্রামের পোটো, গ্রামের কুমোর এদেরই কারিগরির ছাপ নাকি তাঁর আঁকা সব ছবিতে। কিন্তু তাহলে তো বাংলাদেশের গ্রামের ঘরেও সে ছবির সমাদর হোতো। পোটোরা তাহলে তো গুরু বলে মান্য করতো তাঁকে। চাই কি তাঁকে কেন্দ্র করে বাঙালী পটুয়াদের পুনরভ্যুত্থান হওয়াতেই বা বাধা ছিল কোথায়?

অন্যগ্রাম দূরের কথা, তাঁর জন্মস্থান এই বাঁকুড়ার গ্রামেও কোথাও একটি চিত্র দেখলাম না যেটা তাঁর হাতের আঁকা, যদিও ধার করা পশ্চিমীকেতায় তেলরঙে আঁকা অতি অপকৃষ্ট প্রতিকৃতির নমুনা গিল্টিকরা ফ্রেমবাঁধাই হ'য়ে দেয়ালে ঝুলছে।

কাকে বলে গ্রামশিল্পের ধারা? ফোক্‌আর্টের প্রবক্তারা যাই বলুন, গ্রামশিল্পের কোন ধারা তার কতটা প্রাণশক্তি নিয়ে টিকে আছে বাংলাদেশে, যা থেকে কোনো জীবন্ত আধুনিক শিল্পীর পক্ষে পাঠ নেওয়া সম্ভব? তাহলে সেই পাঠশালার দেনজোড়া দরজা তো আমাদের চোখ মনের সামনে খোলাই পড়ে আছে, তা থেকে অপর শিল্পীরা এমন কিছু শিখতে কেন পারলেন না যাতে ক'রে তাঁদের লেখা চিত্রাদিও নেহাতই বালশোভন অনুকৃতিতে পর্যবসিত না হয়ে এমন কিছু হতো যাতে আমাদের চিত্তের ঐশ্বর্য বাড়তে পারে? এমন কোনো শক্তি কি পৃথিবীতে আজ আছে, যা সেই ফোক্‌আর্টকে তার অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে? বিশল্যকরণীর খোঁজ মেলে যে-গন্ধমাদন পর্বতে তার সংবাদ ভূগোলের মানচিত্রে লেখে না, মহাকবির চিত্তাকাশেই শুধু তার চূড়া দেখা যায়। পৃথিবীর শৈশব ফুরিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের গৌরীসেনী টাকা ঢেলে আদিবাসীদের পাড়ায় পাড়ায় সেই শৈশবকে লালন করবার মতো নার্সারি খুলে দিলেও কর্মফলকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এমন কোনো চরিত্রগুণ, এমন কোনো তেজ এবং শক্তি ফোকআর্টের ছিল না যা নিয়ে দিগ্বিজয়ী ইউরোপের সামনে সে মাথা উঁচু ক'রে টিকে থাকতে পারে। সে ছিল নিরিবিলি গ্রাম্য মানুষের মাটির ঘরের খেলনা, লক্ষ্মীপূজোর পট, শীতের কাঁথার নক্সা। ইউরোপ এলো তার প্রকাণ্ড শক্তি আর ভিন্ন সভ্যতার দুর্দান্ত প্রতাপ নিয়ে। দেখতে দেখতে ভেঙে পড়লো বাংলাদেশের পল্লীজীবনের ছন্দ। বেলেতোড়ের গ্রামে মাটির হাতি, মাটির ঘোড়ার মহোৎসব আর কন্দিনই বা চলবে? মাদারার দুয়ারে মানত করতে যাবে না রোগীরা, হাসপাতালে যাবে। বাউড়ি পাড়ার ছেলেমেয়েরা যাবে মাল্‌টিপারপাস ইস্কুলে পড়তে, ফিরে এসে চাকরী খুঁজবে।

ইউরোপ যে সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে আশ্চর্য তারও মহিমা। তার সাহিত্য-শিল্প সঙ্গীত-ভাস্কর্যে মানুষের সীমাহীন আশা আকাঙ্ক্ষা, বীর্য, কামনা, শক্তির অজস্র প্রকাশ। স্বেদশোণিত আর অশ্রু ঢেলে তার দাম দিতেও

হয়েছে তাকে। সাধকে সাধ্য করার ক্ষমতা আছে মানুষের হাতে—তার প্রমাণ দিয়েছে ইউরোপ। যে সভ্যতার একখানা হাত ক্যাথিড্রাল কি স্কাই-স্ক্রেপার বানিয়েছে, তারই অন্য হাত গড়েছে মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য, সেক্সপীয়রের নাটক, রেমব্রান্ট্‌-ভ্যান্‌ গো-র চিত্রকলা, ষ্ট্র্যাভিন্‌স্কির সঙ্গীত। এই সবটা মিলেই ইউরোপীয় সভ্যতার সিম্ফনি বাজছে। আর তার সুর গিয়ে পৌঁচেছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে।

এমন নয় যে ইউরোপ আসার আগে ভারতবর্ষ আর কখনো বিদেশীয়ের রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নেয়নি। কিন্তু ইউরোপের সঙ্গে সেই সব বিজেতাদের একটা প্রকাণ্ড তফাত ছিল এই যে তাদের ছিল শুধু হাতের জোর। জোর যতকাল ছিল ততকাল রাজত্ব চলেছে। গোধূলির অস্তরাগের মতোই তারপর একদিন তা মিলিয়ে গেছে ভারতবর্ষের দিগন্তে। ইউরোপ যখন এলো, শুধু বিজেতার দম্ভ আর পরাক্রম নিয়ে আসেনি। সব গোলাবারুদ, কামান, রণকৌশলের চাইতেও তেজস্কর আরো একটি অস্ত্র ছিল তার হাতে, যামিনী রায়ের ভাষায় যাকে বলা চলে 'জীবনের মানোন্নতি'। নিশির ডাকের মতো অমোঘ রহস্যেভরা ঐ কথাদুটি: আরামে বাঁচো, আয়েসে বাঁচো। মুখের আশ্বাস নয় শুধু, সম্ভাব্যতার উপস্থিত নিদর্শন। ঐ কারখানায় খাটো, ঐ বাক্সে ভোট দাও, রোগ হ'লে ঐ হাসপাতালে এসো, মৃত্যুর পরে ঐ ক্রিমেটোরিয়াম। ইংরেজ আজ ভারতবর্ষের উপকূল থেকে চলে গেছে, আমরা দিনে দিনে ইউরোপ হ'য়ে উঠছি।

যন্ত্রবিপ্লবের পূর্বে এই বিশ্ববিজয়ী ক্ষমতা ইউরোপীয় সভ্যতার ছিল না। যাকে বলি আধুনিক কাল—যার প্রধান সাধনা জীবনের মানোন্নতি—তার সুরু যন্ত্রবিপ্লবের পর থেকে। যা আদিম আর যা আগত, এ দুয়ের অন্তর্বর্তী কালকে মধ্যযুগ বলা অবশ্য বাড়াবাড়ি। কিন্তু মানুষের সমাজ, সভ্যতা, সাধ্য, সাধনা, সব কিছুরই প্রচণ্ড ওলোটপালট ঘ'টে গেছে—মধ্যযুগের পরে রেনেসাঁস থেকে নয়, যন্ত্রবিপ্লব থেকে। ইউরোপের অর্থে আমাদের দেশে কোনো মধ্যযুগ আসেনি। কিন্তু ইউরোপের পক্ষে প্রাচীনের সঙ্গে মধ্যযুগ, মধ্যযুগের সঙ্গে রেনেসাঁস, আর তার সঙ্গে যন্ত্রের বিপ্লবান্ত কাল বিবর্তনের একসূত্রেতায় বাঁধা। একটি থেকেই আর একটির অনিবার্য উদ্ভব। আর সেই বিবর্তনের মূলকেন্দ্রে বিরাজ করছে ফাউষ্টের অমর কামনা। সেই ইউরোপের হাতে আমরা

আত্মসমর্পন করেছি। না ক'রে উপায় ছিল না। রেনেসাঁসের আবির্ভাবে ইউরোপের শৈশব মরেনি, সে মরেছে যন্ত্রবিপ্লবের পরে। ভারতবর্ষে আজ তা মুমূর্ষু, অবিকল হয়তো বা আফ্রিকার আদিম অরণ্যে। কিন্তু নিয়তি সর্বত্রই অমোঘ।

আমাদের মধ্যযুগ নেই, আমরা হঠাৎ একালের প্রচণ্ড তোলপাড়ের মধ্যে জেগে উঠেছি। এবং বর্তমানের গতির মুখ ফেরাতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই। স্বয়ং গান্ধী হার মেনেছিলেন। রেলগাড়ির জানালা থেকে দেখা গ্রামের মাটির দেয়াল, ছায়াভরা অশত্থতলা, গ্রাম্যবালিকার সরল চোখ, শহরে প্রতিষ্ঠিত বাবুর মনকে সময় সময় উতলা করতে পারে, কিন্তু সমগ্র গ্রামজীবনের ব্যাকুল দৃষ্টি তাকিয়ে আছে শহরেরই দিকে, ইশারা পেলেই শহরে এসে ভিড়ে যাবে। অন্ততঃ শহরকে নিয়ে যেতে হবে তাদের দরজায়। তারা গ্রামে থাকে গ্রামকে ভালোবাসে ব'লে নয়, সম্ভবই না ভালোবাসা। গ্রামে থাকে উপায় নেই ব'লে। যন্ত্রযুগের প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্য এবং আয়েসে তাদেরও ঠিক ততটুকু অধিকার, যতটুকু অধিকার আপনার কি আমার, ভাগ্যের দয়ায় চাকরিটি জুটে গেলে মাসান্তে বেতনটি যাদের বাঁধা। তার জন্য জীবনের শান্তি যদি বিসর্জন দিতে হয় তো হবে! আর যাই হোক এযুগেও সাবেকি বর্ণাশ্রম প্রথাকে সমর্থন করা শোভা পায় না।

মনে প্রাণে শহরবাসী হওয়ার বাসনা নিয়ে গ্রাম্যশিল্পকে পোষণ করবে কে? কেনই বা করবে? শহরের জটিলতায় প্রাণ যাদের হাঁপিয়ে ওঠে, কদাচিৎ দুদিনের ছুটি পেলে, তৃতীয় দিন ফিরে এসে শহরকে ফিরে পাবার নিশ্চিন্ত ভরসা নিয়ে গ্রামকে যাঁরা ভালোবাসতে যান, ফোক্ আর্টের কদর করা তাঁদেরই সাজে।

যামিনী রায় যদি বর্তমান গ্রামসংস্কৃতিকেই কল্যাণকর ব'লে মনে করতেন তাহলে তাঁর দেশের সব জমিজমা বিক্রী ক'রে, ফেরবার নৌকো চিরকালের মতো ডুবিয়ে দিয়ে শহরে গিয়ে বসতেন না। অন্তত সমস্ত জীবনের রক্তজলকরা অর্থব্যয় ক'রে বাড়ি তুলতেন না কলকাতা শহরে, যে বাড়িকে তিনি নিজের আঁকা ছবির জন্যেই উৎসর্গ করে দিয়েছেন। মন্দিরের মতো ঝকঝকে তকতকে তাঁর সেই ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে আমরা বহুবার গেছি। তাঁর বাড়িটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেই সন্দেহ থাকবে না যে এই শিল্পীর সঙ্গে বাঙলার গ্রাম্যশিল্পের সংযোগ আবিষ্কার করতে যাওয়া

মূঢ়তা। কলকাতা শহরের সমস্ত উন্মাদ চারিত্র্যহীনতাকে অবহেলায় লজ্জা দিয়ে, বিদেশীগুড়নের প্রকাণ্ড বাড়ির প্রকোষ্ঠ গুলিকে ম্লান করে দিয়ে, দেয়ালজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ছবি। সে ছবির রঙ রেখার রাস্তা ধ'রে কখনোই আমরা বাঙলাদেশের চিরকালের গ্রামে গিয়ে পৌঁছুই না, যে গ্রামের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকবৃন্দ, আগন্তুক আমারই মতো, দুদিনের শারদোৎসব দেখতে দেশে এসেছেন। মনে এসে ইউরোপে হাওয়া না-লাগলে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হতো না বাংলাদেশে। যামিনী রায়েরও না। যদিও দুজনের আত্মবিকাশের পথ ভিন্ন।

সভ্যতার শৈশবকে ফিরিয়ে আনার সাধনা করছেন না যামিনী রায় তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে। তাঁর ছবির সরলতা নয় অজ্ঞান শিশুর সরলতা। গ্রাম্যতা দুর্বল, যেমন দুর্বল শিশু। সভ্যতার সাড়া পেয়ে গ্রাম্যতা তো কবে হার মেনে বসে আছে। যামিনী রায়ের চিত্র হার মানেনি। পশ্চিমী সভ্যতার কলরবকে স্তব্ধ ক'রে দেবার মতো শক্তি তার আছে। যামিনীরায়ের চোখ অতীতের দিকে নয়, ভবিষ্যতের দিকে। যন্ত্রযুগের জটিল দুঃখকে যে-মানুষ জয় করতে পারবে, সে যেন তার প্রাণের হাহাকার নিয়ে ছুটে আসে ঐ ছবির সামনে। গ্রামের লোক ও-ছবির মূল্য জানবে না। হঠাৎ-আধুনিক আমাদের মনেই কি সব সময় জাগে এ-কথা যে সভ্যতার খাঁচায় ঝুলিয়ে রাখা ঐ রঙিন ছবি স্বর্গের বুকে অপরিসীম ক্রোধ জাগিয়ে তুলছে?

বেলেতোড়ে পুজো দেখতে এসেছিলাম। সন্ধ্যার ভাসান দেখে বাড়ি ফেরার পথে মাকিনি ছেলে এডোয়ার্ডের চোখ ছলছল করে উঠল, নিচু গলায় বললে, 'এই গ্রাম যদি আমার হতো, যদি ছেড়ে যেতে না-হোতো কোনোদিন।' শুনে অবাক লাগে। কিন্তু তাকেই সাজে এ কথা বলা। হার্ভার্ডের ক্লাশ পড়াতে গিয়ে গলা তার কেঁপে যেতে পারে কোনো দিন,—বেলেতোড়ের এই কদিনের কথা মনে ক'রে। কিন্তু আমার কাঁপবে না, কেন না আমি জানি কতো সহজ আমার পক্ষে গ্রামে ফেরা, যে-নির্বাসনকে স্বেচ্ছায় কখনো আমি মেনে নিতে চাইব না। আমি শহরেই ফিরতে চাই। ইঁদারায় স্নান করতে গিয়ে চিনু তো কাল সাপ দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়েই পড়েছিল। যাক, আর তো দুটো মাত্র দিন।